অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

**বাক্-সাহিত্য**
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রকাশক—শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর—শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৭/এ, বলাই সিংহ লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—কানাই পাল

## ভূমিকা

আঠোরো বছর বয়সের একটি বাঙালি গৃহস্থকন্যা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ভগবানকে পাবার পিপাসায়, গিরিমরুবনানীর গহন পথে, দুশ্চর তপস্যা করল হিমালয়ের নির্জনে আব অদর্শনের যন্ত্রণায় প্রাণ বিসর্জন করতে গিয়ে পেল তার ইষ্টকে, পরমতমকে—এর আর জুড়ি কোথায়? শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী বললেন, 'যে বড় হয় সে একটিই হয়, তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। যেমন গৌরদাসী।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র নরেন আর মানসকন্যা গৌরী। একজন খাপখোলা তলোয়ার, আরেকজন ত্বরিতস্ফুরিত বিদ্যুল্লেখা। একজন পাতালফোঁড়া শিব, আরেকজন কৃপাসিদ্ধা ব্রজগোপী, কৃষ্ণান্বেষিণী ব্যাকুলতা। একজনের শিবজ্ঞানে জীবসেবা, আরেক-জনের জগদম্বাজ্ঞানে মাতৃসেবা।

'গৌরমা কোথায়? এক হাজার গৌরমার দরকার—ঐ noble stirring spirit.' এই তো স্বামীজির ডাক।

সমস্ত মেয়ের মধ্যেই আছে এই বৈষ্ণবীশক্তি। বৈষ্ণবীশক্তির জীবন্ত বিগ্রহ, অনন্তবীর্যা লোকপাবনী জননী গৌরী এই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে আবির্ভূতা। প্রত্যেক মেয়ে তার জীবনে সেই অমিতশক্তি অমৃতশক্তির সাক্ষাৎলাভ করবে তারই জন্যে এই মাতৃবন্দনা।

অচিন্ত্যকুমার

এই রচনার উপাদান নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী থেকে সংগ্রহ করেছি

গৌরীমা ( শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম )

সারদা-রামকৃষ্ণ ( শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম )

শ্রীশ্রীমায়ের কথা ( উদ্বোধন )

অক্ষয়কুমার সেনকৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'

স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী'

স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত 'শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা'

গৌরী মা

[ শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের সৌজন্যে ]

বিয়ের সভায় বর এসে বসেছে। লগ্ন যায়-যায়।

কিন্তু কনে কই ? সে কী, আর দেরি কেন ? কনেকে নিয়ে এস। সভাস্থ করো।

কোথায় কনে ? হলদে পাখি উড়ে গিয়েছে।

'কোথায় মান্তু ?' গিরিবালাকে জিজ্ঞেস করলেন পার্বতীচরণ।

দরজা-দেওয়া বন্ধ ঘর দেখিয়ে দিল গিরিবালা।

'যেমন করে পারো বার করে নিয়ে এস।'

'বাপ ভাই সকলে মিলে বোঝাতে পারলে না, আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করব!' অসহায় চোখে তাকাল গিরিবালা।

'তুমি মা, পারলে তুমিই পারবে!' পার্বতীচরণ গ[illegible] উঠলেন : 'যাও, দরজায় ধাক্কা মারো।'

'আচ্ছা, তোমরা যাও, হৈ-হল্লা কোরো না, আমি দেখছি।'

ভিড় সবে গেলে গিরিবালা দরজায় মৃদু করাঘাত করল। ডাকল, 'মান্তু!'

কোনো সাড়া নেই।

'মান্তু, কোনো ভয় নেই, দোর খুলে দে লক্ষ্মীটি।'

কেউ উঠল না, নড়ল না, শব্দ করল [illegible]।

সেই কখন থেকে পোড়ো ঘরটাতে বন্ধ হয়ে আছে মৃড়ানী।

একা আছে? না, একা নেই, সঙ্গে আছে তার নিত্যপূজার দামোদর আর শ্রীগৌরাঙ্গের পট একখানি।

কী ব্যাপার? বিয়ের রাতে কন্যা কেন বিপরীত?

'আমি ওকে বিয়ে করব না, কিছুতেই না।' মৃড়ানী গোঁ ধরেছে।

সন্ধের থেকেই তার রণচণ্ডী মূর্তি। যে কেউ কিছু বলতে আসে কটূক্তি করে। শাসন বা অনুরোধ কোনো কিছুতেই টলেনা, গলেনা। 'ওকে বিয়ে করব না, কিছুতেই না।' এই এক সৃষ্টিছাড়া প্রতিজ্ঞাকে আঁকড়ে থাকে।

'তোমরা সরে যাও বলছি। আমার কাছে এসনা। যদি আসবে তো—' মৃড়ানী রুদ্রাণী হয়ে ওঠে। পাড়াপড়শী আত্মীয় স্বজন সকলের উদ্দেশে ইট পাটকেল খুরি গেলাস ছুঁড়ে মারে। 'পালাও বলছি সকলে। পালাও।' আস্ত একটা দইয়ের ভাঁড় এবার ভাঙল উঠোনে।

প্রতিপক্ষও খেপে গেল। 'এ কী অন্যায় কথা! তেরো বছরের এইটুকু মেয়ে, তার কিনা এই দুর্বার তেজ! এ আমরা কিছুতে সহ্য করব না।'

'না, না, ওকে বিয়ে করব না কিছুতেই।'

তবে কি মৃড়ানীর পাত্রে আপত্তি?

সে আপত্তি তো আছেই। নিজের ভগ্নীপতিই পাত্র বলে নির্বাচিত হয়েছে।

সে কী কথা?

তা ছাড়া ঐ দুরন্ত মেয়েকে কে স্থান দেবে? বিয়ের পর শ্বশুর-বাড়ি গেলে দিদি বিপিনকালী দেখতে-শুনতে পারবে। মৃড়ানীর কোনো কষ্ট হবেনা।

'আমরা যাকে পাত্র বলে ঠিক করেছি তাকেই বর বলে মানতে হবে।' আত্মীয় অভিভাবকের দলও মরীয়া হয়ে উঠল।

'না, না, কিছুতে না।' হারানো জিনিসপত্রের জঞ্জাল জড়ো করা হয়েছে যে পোড়ো ঘরটায় সেখানে ঢুকে দরজা বন্ধ করল মৃড়ানী। বললে, 'শুধু ওকে নয় নয়, কোনো মানুষকেই বিয়ে করব না আমি। যে বর মরে যায় তাকে দিয়ে আমি কী করব ?'

যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্যাম ?

'শোনো আজগুবি কথা।' আত্মীয়-অভিভাবকেরা থ বনে গেল। 'যে করে পারো মেয়েটাকে বার করে আনো। ওর জেদ কিছুতেই টিকতে দেব না। জোর করে বিয়ে দেব। এ লগ্ন যায় তো পরের লগ্নে।'

তখন গিরিবালাকে পাঠাল সকলে। মেয়েকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাও। হোক ভগ্নীপতি, ভোলানাথ মুখুজ্জে পানিহাটির একজন ধনী-মানী লোক। মৃড়ানী তার কাছে সুখে থাকবে।

ধারে-কাছে লোকজন কেউ নেই, গিরিবালা আবার ডাকল: 'মান্তু, মা, লক্ষ্মীটি, দরজা খোল। আমাকে বিশ্বাস কর--'

দরজা খুলে দিল মৃড়ানী।

গিরিবালা দেখল মৃড়ানী অঝোরে কাঁদছে।

'এ কী, বিয়ে নয় তোর? সাজবি-গুজবি না? চল, আয় আমার সঙ্গে।'

মৃড়ানী দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরল। নিরর্গল কান্নায় বললে, 'মা, ভগবান আমার স্বামী, ভগবান ছাড়া কাউকে আমি বিয়ে করব না।'

গিরিবালা এক মুহূর্তে বুঝে নিল মেয়েকে। তাকিয়ে দেখল মেয়ের মুখে অপূর্ব তেজ, আশ্চর্য আভা। ও যেন এ জগতের মাটির তৈরি পুতুল নয়।

'তবে তাই।' চকিতে মন স্থির করল গিরিবালা। 'তোকে আমি ভগবানের পায়েই নিবেদন করলাম। তোর জীবনে যদি বৈরাগ্যের ফুল ফুটে থাকে আমি তা ছিঁড়ে নেব না, কাউকে দেবও

না ছিঁড়ে নিতে।' সহসা গলা খাটো করল গিরিবালা : 'শোন, পালাবি ?'

পরম বিস্ময়ে মায়ের মুখের দিকে তাকাল মৃড়ানী।

অমন মা বলেই তো এমন মেয়ে !

'পালাব।'

'তা হলে খিড়কির দরজা খুলে দিচ্ছি, তোর ঠানদির বাড়ি চলে যা।' বললে গিরিবালা, 'সেইখানে গিয়ে লুকিয়ে থাক। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে, ওরা এসে পড়বে। মারধোর করে নিয়ে যাবে, গায়ের জোরে দিয়ে দেবে বিয়ে। তাই আর দেরি করিসনে—'

আঁচলের তলায় বুকের কাছে তার দামোদর আর গৌরাঙ্গকে নিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে গেল মৃড়ানী।

গিরিবালা আচ্ছাদন করে রইল। বললে, 'ভয় নেই, ভগবানই সকল বিপদ থেকে তোকে রক্ষে করবেন।'

কোথায়, কোথায় মৃড়ানী ?

হলদে পাখি, খাঁচায় নেই। উড়ে পালিয়েছে

গিরিবালা ছাড়া এ যুগে আর কোন মা আছে যে মেয়েকে বৈরাগিনী সাজিয়ে পাঠাবে ভগবানের বাসরঘরে !

গিরিবালা নিজেই যে কালীর উপাসিকা। 'জাগো কুলকুণ্ডলিনী আধার কমল হতে—' এ যে তারই সাধনমন্ত্র।

'হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো, হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো, হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম, হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে।' কবে তুমি আমার নয়নগোচর হবে ? এই অধন্য দিন কবে পার হব ?

'কাহাঁ করো, কাহাঁ পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন !'

মৃড়ানী কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী।

গৌরাঙ্গের দাসী, তাই তার নাম হল গৌরদাসী। গৌরের যে দাসী সেই গৌরী। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে তাই গৌরী বলেই ডাকতেন। যখন তাকে সন্ন্যাস দেন তার নাম দেন গৌরী-আনন্দ।

বলরাম বসুর বাড়ি থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসছে গৌরী।

দক্ষিণেশ্বরে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'গৌরী এলে তার বেশবাসটা একটু লক্ষ্য করিস।'

'সে আবার কী!' চঞ্চল হল ভক্তের দল।

'দেখিস আজ তার কাপড় পরার ধরন।'

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল ভক্তেরা।

'তার কাপড় পরার ধরনে দেখবি সে যেন ঠিক ব্রজের মেয়ে।' ঠাকুর বললেন গম্ভীর মুখে : 'ও যে সত্যি ব্রজের গোপী।'

কতক্ষণ পরেই গৌরী এসে উপস্থিত।

'আমি জানতাম তুই আজ এই বেশে আসবি।' উল্লসিত হলেন ঠাকুর : 'এতক্ষণ তাই বলছিলাম এদের।'

পরিহিত কাপড়ের দিকে নজর পড়ল গৌরীর। ধরা পড়ে গিয়েছে বুঝি। তাড়াতাড়ি পালাল নবতে। মা ঠাকরুনের আশ্রয়ে।

গোপীরা কৃষ্ণপ্রাণা, তাদের সমস্ত জীবন কৃষ্ণজিজ্ঞাসা। তারা কৃষ্ণান্বেষিণী ব্যাকুলতা। তারাই অখিলাত্মা ভগবানে রূঢ়ভাবা। 'মর্য্যপিতাত্মা ইচ্ছতি মদ্বিনাঽন্যৎ।' তাদের আত্মা কৃষ্ণার্পিত, কৃষ্ণ ছাড়া তাদের আর কিছু চাইবার নেই।

শিবপুর থেকে একদল ভক্ত এসেছে, গোপীযন্ত্র নিয়ে গান করছে ঠাকুরের কাছে। কিন্তু এ কী তাদের গানের বিষয়! গাইছে : 'আমরা পাপী, আমাদের কর হে উদ্ধার।'

ঠাকুর বললেন, 'সে কী গো! ভয় পেয়ে, ভয় দেখিয়ে যে ভজন, তা প্রবর্তকের, ভক্তের নয়। ভক্তির গান গাও, আনন্দের গান। ভগবানকে লাভ করার আনন্দ। কেবল অশান্তির কথা, বিলাপের

কথা, ভালো নয়। তাঁকে নিয়ে মাতোয়ারা হও, ডুবে যাও তাঁর নামের মদিরায়।'

'আপনি যদি গান একখানা—' ধরল ভক্তের দল।

ঠাকুর গান ধরলেন : 'গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।'

বললেন, 'গোপীরা ব্রহ্মজ্ঞান চাইত না। তাদের শুধু ঈশ্বর-সম্ভোগ কেউ বাৎসল্যে কেউ সখ্যে কেউ মধুরে কেউ বা দাসী হয়ে ঈশ্বরকে চাইত আস্বাদ করতে। আর তাদের কী নিষ্ঠা! মথুরায় পাগড়ি বাঁধা কৃষ্ণকে তারা চিনতেই চাইল না, হেঁটমুখ হয়ে রইল। এ পাগড়ি-বাঁধা আবার কে! আমাদের পীতধড়া মোহনচূড়া পরা সেই প্রাণবল্লভ কোথায়?'

গোপীদের প্রেমোন্মাদ। আবার বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ: 'কৃষ্ণ-বলরাম মথুরা যাবার জন্যে রথে উঠল। রথের চাকা ধরে রইল গোপীরা, যেতে দেবেনা।' বলতে-বলতেই গান ধরলেন ঠাকুর: 'রথ কি চক্রে চলে?'

'ধোরো না ধোরো না রথচক্র, রথ কি চক্রে চলে?
যে চক্রের চক্রী হরি, যার চক্রে জগৎ চলে॥'

'রথ কি চক্রে চলে? এ কথাটা আমার ভারি ভালো লাগে।' বলছেন আবার ঠাকুর : 'যে চক্রে ব্রহ্মাণ্ড ঘোরে। এ হচ্ছে, রথীর আদেশ লয়ে সারথি চালায়।'

বনে-বনে ঘুরতে-ঘুরতে রামচন্দ্র ষাট হাজার ঋষি দেখেছিলেন। তারা রামচন্দ্রকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল আর তাদের দেখে রামচন্দ্রের চোখে উদ্বেল স্নেহ। সেই ঋষিরাই দ্বাপরে গোপী।

শুধু আমাদের কৃষ্ণ সুখী হোক। তার সুখেই আমাদের তৃপ্তি। তার কুশলেই আমাদের সর্ব আকাঙ্ক্ষার শ্রেয়।

সেই গোপীদেরই একজন মৃড়ানী।

কেউ-কেউ তাকে বলে 'দামুর বউ'। মানে, শ্রীশ্রীদামোদরের পত্নী।
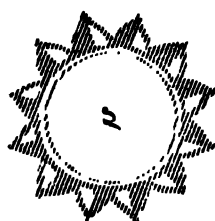
শবরীও এমনি পালিয়েছিল বিয়ের রাতে। গিরিধর গোপাল বিনা কেউ আর তার স্বামী নয়, নয় কেউ প্রাণপ্রেষ্ঠ!

শবরী পেয়েছিল তার রামকে। মৃড়ানীও পেল তার কৃষ্ণকে, দামোদরকে। গৌরসুন্দরকে।

আর গৌরহরি রাধাকৃষ্ণের একত্ররূপ। কখনো কৃষ্ণ, কখনো রাধা। কখনো রসরাজ, কখনো মহাভাব। কখনো গোবিন্দ, কখনো গোবিন্দানন্দিনী, সর্বকান্তাশিরোমণি, সর্বগুণখনি রাধিকা।

সেই গৌরহরিই কি মৃড়ানীর স্বামী?

পাশেই ঠানদির বাড়িতে আশ্রয় নিল মৃড়ানী। ঠানদি আর কেউ নয়, গিরিবালার বিধবা এক মামিমা।

মৃড়ানী বুঝল এ আশ্রয় টেঁকসই নয়। ঠানদিটি ' তিকূল।

স্থির করল, পালাবে এখান থেকে। পালাবে ভোর রাত্রে, ঠানদি যখন ঘুমে অসহায়।

'কি রে, উসখুস করছিস কেন?'

কী আশ্চর্য, ঠানদি ঠিক জেগে পড়েছেন!

'আমি এখান থেকে চলে যাব ঠানদি।'

'সে কি রে, কোথায় যাবি?'

'যে দিকে দু চোখ যায়।' মৃড়ানী তাকাল বিহ্বল চোখে: 'যে দিকে গেলে পাওয়া যায় ভগবানকে।'

'সে কী সর্বনাশের কথা!' ঠানদি মৃড়ানীর হাত চেপে ধরলেন: 'তোর মা যে তোকে রেখে গেল আমার কাছে।'

'বেশ তো, তবে তোমার কাছেই আমাকে রেখে দাও লুকিয়ে।' মিনতিভরা চোখে তাকাল মৃড়ানী: 'কাউকে তা জানতে দিও না।'

তাই হবে। আশ্বাস দিলেন ঠানদি। মৃড়ানীকে নিরস্ত করলেন।

এদিকে মহাসোরগোল। খোঁজ, খোঁজ, মান্তু গেল কোথায়? কোথায় পালাল? জলে ডুবে মরেনি তো? হয়নি তো কোনো অঘটন?

কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না মান্তুকে। রাতের অন্ধকারে কোথাও একটিও তার রেখা-লেখা নেই। এখন উপায়?

বাড়ির সকলে মিলে রাষ্ট্র করে দিল, সম্প্রদান মেয়ের ঠিকই হয়ে গিয়েছিল, তারপর কেন কে জানে তার আর পাত্তা মিলছে না।

কিন্তু কোথায় সে সত্যি যেতে পারে? পাড়াপড়শীদের বাড়ি খোঁজো।

ঠানদি প্রমাদ গুনলেন। গোপন কথাটা ফাঁস করে দিলেন। ওগো, মান্তু আমার এখানে এসে রয়েছে। ভয় নেই, ভালো আছে, নিখুঁত আছে।

'এখানে এল কী করে?' পার্বতীচরণ গর্জে উঠলেন।

'আমি তার কী জানি।' ভয়ে পাংশু হয়ে গেলেন ঠানদি: 'মেয়েকে গিরিবালাই পৌঁছে দিয়ে গেছে।'

তখন সকলে মিলে গিরিবালাকে নিয়ে পড়লেন। তুমি মা হয়ে মেয়ের আখের মাটি করলে?

মেয়ে আমার বিরাটের ডাক শুনেছে, শুনেছে বৈরাগ্যের বাঁশি। আমি সব জেনে শুনেও যদি তার ইষ্টপথে সাহায্য না করি তবে আমি কেমনতরো মা? তবে আমি কেমনতরো কালীর উপাসিকা?

সমস্ত তিরস্কার অগ্রাহ্য করল গিরিবালা। মেয়েকে আঁচলের আড়াল করে বাড়ি নিয়ে এল। থাকবার জন্যে দিল তাকে একটা আলাদা ঘর। তোমরা আমার মেয়েকে ব্যস্ত কোরো না, তাকে আপন মনে স্তবকীর্তন করতে দাও। করতে দাও ধ্যানধারণা।

কেউ আর তাকে বিরক্ত করছে না বটে কিন্তু মৃড়ানীর মনে শান্তি নেই। কিছুই হচ্ছে না মনের মত। প্রাণ ভরে উঠছে না। তীক্ষ্ণ হচ্ছে না অভিনিবেশ। দৃঢ় হচ্ছে না বৈরাগ্য। যাকে দর্শন করবার জন্যে আমার দু চোখ পিপাসিত সে কোথায়?

চণ্ডীমামার কাছে হিমালয়ের গল্প শুনেছে মৃড়ানী। গহনে-গোপনে বসে সাধু সন্নেসীদের তপস্যা করার কথা। কী আনন্দে সহ্য করছে প্রাকৃতিক নির্দয়তা! কী অমৃত পেয়েছে যে উঠছে না আসন থেকে! সেই আনন্দ সেই অমৃত পেতে পারে না মৃড়ানী? এ সংসারপরিবেশে কোথায় সেই পূর্ণতা, সেই উপলব্ধি।

মৃড়ানী আবার পালাল।

ভোররাতে ঘর থেকে বেরুল গুটিগুটি। সদরে বসে দারোয়ান ঢুলছে। কে যায়? তন্দ্রায় ভরা চোখ তুলে জিগগেস করলে দারোয়ান।

'আমি।' মৃড়ানী বললে।

'কোথায়?'

'গঙ্গাস্নানে।'

ঘুমে আবার ঢলে পড়ল দারোয়ান।

মৃড়ানী বড় রাস্তায় পড়ে ছুটতে লাগল। কিন্তু কতদূর যেতেই সামনে বাধা পড়ল। দেখল তার বাড়ির দরজা। চলল অন্য পথে, অন্য দিকে, কিন্তু কতদূর যেতেই আবার সেই দরজার বাধা। তবে বোধ হয় উলটো দিকটাই ঠিক। ছুটল নতুন পথে, নতুন দিকে, আবার সেই অঘটন। এ কী দৈবী মায়া! কিছুতেই পথ খোলসা

পাচ্ছে না মৃড়ানী। চারদিকেই বন্ধ দরজা তাকে ঘা মারছে। তবে কি সে ফিরে যাবে? তার সময় হয়নি এখনো?

কে বলে হয়নি? মৃড়ানী আরেক পথ নিল। আবার ছুটল।

পিছনে কারা যেন আসছে তাকে ধরতে। হ্যাঁ, সন্দেহ কী, তারই বাড়ির লোকজন।

'এ কী, তোমরা টের পেলে কী করে?' সপ্রতিভের মত জিজ্ঞেস করল মৃড়ানী।

'দারোয়ানই বলে দিয়েছে।'

'বা, সে তো আমাকে আটকালো না, পথ ছেড়ে দিল—'

'ঘুমের ঝোঁকে প্রথমটা বুঝতে পারেনি। পরে তন্দ্রা ছুটে যেতেই খেয়াল হল, খিড়কি দরজা দিয়ে গঙ্গায় না গিয়ে দিদিমণি সদর দিয়ে গেল কেন? তা হলে, নিশ্চয়ই পালিয়ে যাবার মতলব। সঙ্গে সঙ্গেই হৈ চৈ করে উঠল। আমরা চারদিকে বেরিয়ে পড়লাম।'

এবার একটা ছোট ঘরে মৃড়ানীকে নজরবন্দী করা হল।

'বেশ তো, তোর বিয়ের চেষ্টা আর করবনা, তুই ঘরে থাক শান্ত হয়ে।'

'এই ছোট ঘরে আমাকে ধরছেনা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমি ছড়িয়ে পড়তে চাই। আর শান্তি? সেই মহৎসঙ্গ ছাড়া আমার শান্তি কই?'

'চল তোকে তীর্থে নিয়ে যাই।'

'সেই দুখানি পাদপদ্ম নিয়ে এস, তাই আমার তীর্থ।'

'সাধুদর্শনে যাবি?'

মৃড়ানী চঞ্চল হয়ে ওঠে: 'কই, নিমতেঘোলার সেই সাধুটি কোথায়? মা, একবারটি তাঁর খোঁজ নাও না মা। তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চলো।'

তোমার পাদপদ্ম প্রণতজনের আর্তি দূর করবার জন্যে অনুক্ষণ

উৎসুক। তা একদিন দানদর্পী বলিকে অবনত করেছিল, লীলাচ্ছলে অতিক্রম করেছিল, স্বর্গ-মর্ত। ঐ পাদপদ্মই তো আমার একমাত্র জুড়োবার জায়গা, আমার অনন্তকালের আশ্রয়, পরমতম প্রভূততম বিত্ত। কবে প্রভু নিজের ধন নিজে চিনে নেব?

একলা তোমারই নিত্যকিঙ্কর হয়ে থাকা, তোমাকেই জীবনের একমাত্র স্বামী করে চলা, তোমারই প্রীতির জন্যে সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে রাখা সেই মহাজীবন আমার কবে লাভ হবে?
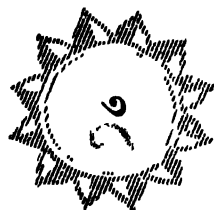
'তুমি খেলছ না? একলাটি বসে আছ চুপচাপ?'

ডাগর চোখ তুলে আগন্তুকের দিকে তাকাল মৃড়ানী। কী সুন্দর দেখতে পথিককে। চারদিক যেন আলো করে দাঁড়িয়েছে।

দশ বছরের মেয়ে, গায়ে কনকচাঁপার রঙ, গা ভরা লাবণ্যের স্রোত, উদাসীন হয়ে বসে আছে। বাড়ির বাইরের উঠোনে এক-দঙ্গল ছেলেমেয়ে খেলা করছে, তাদের দলে য়ে ভেড়েনি। নিঃসম্পর্ক নির্জনে বসে আছে একমনে।

'সবাই খেলছে, আর তুমিই দলছুট?'

মৃড়ানী বললে, 'ও সব খেলা আমার ভালো লাগে না।'

'তবে কোন খেলা ভালো লাগে?'

অভিভূতের মত পথিকের দিকে তাকাল মৃড়ানী। কী মনে হল কে জানে, হাত বাড়িয়ে তাকে প্রণাম করল।

'কৃষ্ণে মতি হোক।' পথিক তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল।

'ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল। সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥' যা কিছু মানুষ শ্রেয় বলে কামনা করে—কর্ম তপস্যা জ্ঞান বৈরাগ্য, স্বর্গ মোক্ষ বৈকুণ্ঠ, শুধু ভক্তিযোগেই লাভ করতে পারে অনায়াসে। যে ভাব চিত্তে পোষণ করে কৃষ্ণকে ভজন করো, সেই ভাবানুরূপ বস্তুই দিয়ে দেবেন কৃষ্ণ। সে যে ভক্তবাসনার কল্পবৃক্ষ। সে যে ভক্তপরাধীন। ভক্তভৃত্য।

কৃষ্ণে মতি হোক। কৃষ্ণকে ভালোবাসতে শেখ। রতি হলেই মতি হবে। নিজেব সুখ চাইনা, শুধু কৃষ্ণেব সুখ চাই—এইই তো কৃষ্ণে রতি। 'কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য হয় প্রেম মহাবল॥' শুধু কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণানুকূল্য। চন্দ্রাবলীর আত্মপ্রীতি নয় রাধিকার কৃষ্ণপ্রীতি। 'সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ।' সমস্ত সুখের অবসান কৃষ্ণসুখে। এমন যে নিজদেহপ্রীতি তাও কৃষ্ণপ্রীতির জন্যে। কৃষ্ণই একমাত্র তৃষ্ণা।

'এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তার ধন তার এই সম্ভোগ সাধন॥
এ দেহ দর্শনস্পর্শে কৃষ্ণ সন্তাষণ।
এই ল.গি কবে দেহে মার্জন-ভূষণ॥'

তুমি কৃষ্ণময়ী হয়ে ওঠো।

পথিক চলে গেল আপন মনে। তার যাওয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মৃড়ানী। যেন প্রাণ নিঙড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

কে এ পথিক ?

মৃড়ানী খোঁজ নিয়ে জানল দক্ষিণেশ্বরেব কে এক সাধু। কোন এক কলাবাগানে বসে সাধন করে।

সমস্ত মনপ্রাণ বলে উঠল যেতে হবে দক্ষিণেশ্বর। দেখতে হবে সাধুকে।

খুঁজতে খুঁজতে কোথায় চলে এসেছে একা-একা।

এ গাঁয়ের নাম নিমতেঘোলা। মাঠে চাষ করছে কৃষাণেরা, জিজ্ঞেস করতে বললে মৃড়ানীকে। আর পাশেই দক্ষিণেশ্বর।

দক্ষিণেশ্বর!

'ঐখানে কলাবাগানে কোনো ঠাকুরমশাই থাকেন?' বালিকার দুই চোখ উদ্বেল হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, থাকেন। যাওনা এগিয়ে। ঐ তো কলাবাগান দেখা যাচ্ছে।'

ব্যাকুল পায়ে এগুলো মৃড়ানী। ভয় নেই এতটুকু। যেন কোন আপনজনের কাছে যাচ্ছে! চিরন্তন আপন।

বাগানে ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর, দরজা দেওয়া। মৃড়ানী ভড়কাল না, দিব্যি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। সন্দেহ কি, ঘরের মধ্যে সেই সাধু। যে বলেছিল কৃষ্ণে মতি হোক! সেই পথ-জানা পথিক।

দেখে মৃড়ানী অবাক হয়ে গেল। ধ্যানমুদ্রিত চোখে আসনে নিশ্চল হয়ে বসে আছে সাধু। সমস্ত ঘর আলো করে বসে আছে। আনন্দে সমস্ত উপস্থিতিটাই তপ্ত-দীপ্ত।

কী হল কে জানে, মৃড়ানী তাকে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে।

তবু ধ্যান ভাঙে না সাধুর।

'তুই এসেছিস?' ধ্যান ভেঙে তাকাল সাধু। ন বললেন, জানতাম তুই আসবি। আমি জল ঢালব আর তুই কাদা চটকাবি। তাই তোকে আসতেই হবে।

'কাল ভোরে গঙ্গাস্নান করে আসবি, তোকে দীক্ষা দেব।' সাধু বললে।

মৃড়ানী খুশিতে উথলে উঠল। তা হলে আর কী চাই! কিন্তু এই রাতটুকু থাকি কোথায়?' বাড়ি গেলে কাল ভোরে ফিরে আসা অসম্ভব। এ সোনার সুযোগ হারানো যাবে না। কিছুতেই। কাল খুব ভালো দিন। কাল রাসযাত্রা।

পাশেই এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়ি মৃড়ানী আশ্রয় পেল।

'এই রাতটুকু শুধু তোমাদের ওখানে থাকবে।' সাধু বলে দিলেন। 'কাল ভোরে গঙ্গাস্নান করে আসবে আমার কাছে, আমি ওকে দীক্ষা দেব।'

রাসপূর্ণিমার পুণ্য তিথি। মৃড়ানীকে দীক্ষা দিল সাধু।

'নাম জপ করো।'

নাম জপ করতে করতে মৃড়ানী তন্ময় হয়ে গেল। হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়াল বুঝি শ্রীকৃষ্ণ।

রাসলীলা ভৌম বৃন্দাবনে নয়, মনোবৃন্দাবনে। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সংযোগ। প্রেমমহোৎসব। কৃষ্ণ রসিকশেখর, রসাস্বাদক, আর রাধিকা রাসবাসিনী রাসেশ্বরী। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। কৃষ্ণ আরাধ্য, রাধা আরাধিকা। প্রেমের পরমসার যে মহাভাব তারই প্রতিমূর্তি। আর এ প্রেম কামগন্ধহীন। নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ—আনন্দং নন্দনাতীতং।

'এ কী, মাস্তু এখানে!'

আত্মীয়স্বজনেরা তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে যেতে চাইল। চলো না বাড়ি, দেখবে কেমন তোমাকে বেঁধে রাখি শাসনে।

সাধু বললেন, 'খবরদার, ওকে যেন বোকো না। মারধোর কোরো না।'

বড় ভাই অবিনাশ বললে, 'আর কিছু না হোক, খাঁচায় পুরে রাখব পাখিকে।'

'ও হলদে পাখি।' হাসল সাধু। 'ওকে কে ধরে রাখবে?'

সাধুর আশ্রয় ছেড়ে যেতে চায়না মৃড়ানী।

সাধু বললে, 'এবার যাও। আবার আমাদের দেখা হবে।'

'হবে? কোথায়?'

'গঙ্গাতীরে।'

যায়, যায়, আবার ফিরে ফিরে তাকায় মৃড়ানী।

চোখে বুঝি বা আশা, সমুৎকণ্ঠা।

আবার পাব তোমাকে, দেখব তোমাকে, তুমি আমাকে কৃপা করবে এই দৃঢ়া সম্ভাবনার নামই আশা আশাবন্ধ। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন, দৃঢ় করি মনে।' আর নিজের অভীষ্টপ্রাপ্তির জন্যে যে গুরুতর লোভ তার নাম সমুৎকণ্ঠা।

কবে সমস্ত অভিলাষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই ধাবিত হবে। কবে লুপ্ত হবে অন্যেচ্ছা। কবে দৃঢ়বদ্ধ আশা জন্মাবে যে তোমাকে পাবই পাব, কবে সে প্রাপ্তির জন্যে জাগবে বলবতী ব্যাকুলতা! কবে চিত্ত দ্রব হবে, স্নিগ্ধ হবে, মসৃণ হবে! কবে জাগবে অব্যর্থকালত্ব। 'কৃষ্ণের সঙ্গ বিনা কাল নাহি যায়।' কবে সমস্ত পরমায়ু কৃষ্ণকেই অর্পণ করব।

বাড়ি ফিরে এসে চণ্ডীমামার কাছে গল্প শুনতে বসল মৃড়ানী। চণ্ডীমামা অনেক দেশ ঘুরেছে, দেখেছে অনেক তীর্থ।

'কোন তীর্থে কোন দেবতা আছে জানিস?'

'বা, আমি কী করে জানব? আমি কি বাড়ির বাইরে গেছি কখনো?'

'কে জানে কোথায় যাবি।' চণ্ডীমামা জমিয়ে বসে। বলে, 'তোর হাত দেখেছি আমি। সে হাতে লেখা আছে তুই যোগিনী হবি।'

'দেশভ্রমণে যাব চণ্ডীমামা?' তাতেই যেন বেশি আগ্রহ মৃড়ানীর।

'হাতে তোর তারই তো রেখা আঁকা।' চণ্ডীমামা একটু বুঝি বা উদাস হয়ে যায়। বলে, 'পার্থিব বৈভবে তোর স্পৃহা থাকবে না। ধার ধারবি না আভরণের।'

উৎফুল্ল হয়ে ওঠে মৃড়ানী। উজ্জ্বল চোখে বলে, 'জানো না সেদিন কী হয়েছিল?'

চণ্ডীমামা উৎসুক হয়ে শুনতে থাকে।

'সেদিন দাদা, আমাকে গঙ্গায় নৌকো করে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আরো কত মেয়ে দেখলাম চলেছে বেড়াতে, সকলের গায়েই গয়নার বোঝা। ভাবছিলাম মেয়েরা অত গয়না পরে কেন, কী আছে ওর মধ্যে? আমার যদি গয়না না থাকে তা হলে কী হয়? দুঃখ হয়? এক গাছি করে সোনার বালা হাতে ছিল, দাদার চোখের আড়ালে বালা দুটো খুলে নিলাম, ফেলে দিলাম নদীতে।' হাসতে লাগল মৃড়ানী।

'ফেলে দিলি?'

'দিলাম। বাড়ি এসে বকুনিও খেলাম খুব।' তিরস্কার যেন কত বড় পুরস্কার এমনি সারল্যে হাসল মৃড়ানী।

চণ্ডীমামা খুশি হোল কিন্তু বাড়ির আর সকলে অসন্তুষ্ট। শৈশবেই এই বৈরাগ্যলক্ষণ ভালো নয়।

তারপরে মাছমাংস খাবে না মৃড়ানী।

'সে কী, মাছমাংস খাবিনা কেন?' ধমকে ওঠে সংসারীরা।

'যুক্তিতর্ক জানিনা।' বললে মৃড়ানী। 'খেতে ভালো লাগে না। মন বলে, খাবিনে।'

'কেন, তুই কি বিধবা?'

মৃড়ানী হাসে। সে চিরসীমন্তিনী। মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহিণী।

এমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড কেউ দেখেনি। এই একফোঁটা মেয়ে, সাজবে না গুজবে না মাছ খাবে না গয়না পরবে না, উদাসিনীর মত ঘুরে বেড়াবে। এই পৃথিবীর ধুলোতেই কোথায় যেন আছে এক রহস্যের রাজ্য তারই সন্ধানে তাকাবে দিগন্তের দিকে।
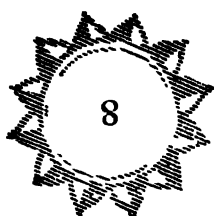
মেয়েকে বাঁধো। পাদ্রীদের স্কুলে ভর্তি করে দাও।

বিশপ মিলম্যান আর তার বোন মিস মেরিয়া মিলম্যান স্কুল খুলেছে ভবানীপুরে, মৃড়ানীকে ভর্তি করে দেওয়া হল।

সর্ববিষয়ে প্রথম হল মৃড়ানী। সোনার মেডেল পেল। মিস মিলম্যান-এর আনন্দ ধরে না। বলে, 'চলো তোমাকে বিলেত নিয়ে যাই। মানুষ করি।'

মৃড়ানী হাসল। বললে, 'মানুষ আমি এ দেশে থেকেই হতে পারব।'

কত দিন পরেই স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা মিস হারফোর্ডের সঙ্গে বিরোধ বাধল মৃড়ানীর। উপাসনা নিয়ে বিরোধ। যী শুকে ভজনা করতে দোষ নেই কিন্তু আমার কৃষ্ণকেও আমি ভজনা করব।

তা হবে না।

কেন হবেনা? মাতা মেরীর কোলে যেমন যীশু তেমনি যশোমতীর কোলে আমার গোপাল।

বিরোধের ফলে মৃডানী স্কুল ছেড়ে দিল। আরো অনেক ছাত্রী তার সঙ্গ নিল। 'আলাদা স্কুল খুলব আমরা।' আঁচলে কোমর বাঁধল মৃড়ানী।

পাদ্রীরা প্রমাদ গুণল। বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে দেরি করল না। অন্যান্য ছাত্রীরা ফিরে গেল স্কুলে। মৃড়ানী ফিরল না। ঐ পুঁথির বিদ্যায় আমার কী হবে?

আসল বিদ্যা কৃষ্ণভক্তি। 'যেই রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ।'

ভগবৎপ্রীতি অন্যতাৎপর্যহীনা। কৃষ্ণ সুখী হোক এ ছাড়া অন্য বাসনার ঠাঁই নেই।

কৃষ্ণ সুখী কিসে?' সেবায়। কী রকম সেবা? প্রিয়জ্ঞানে সেবা। 'প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ।' প্রীতি অহৈতুকী, অনিমিত্তা। শুধু কৃষ্ণ-প্রীতিসাধনের বাসনাতেই চিত্ত শুদ্ধ, দ্রবীভূত। আর চিত্ত দ্রবীভূত হলেই জাগবে দর্শনোৎকণ্ঠা। আর জীবনের উদ্দেশ্য কী? জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরপ্রাপ্তি।

পূজার ঘরেই শিক্ষা নিতে লাগল মৃড়ানী। পড়তে লাগল রামায়ণ আর মহাভারত, চণ্ডী আর গীতা, পড়তে লাগল স্তবস্তোত্র। জলের মত মুখস্ত হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এ সমস্তের যোগফল কী? আর কিছু নয়, শুধু স্বতঃস্বাদময়ী ভাগবতী প্রীতি।

কোনোরকমে একবার ভগবানে ভালোবাসা পড়ে কিনা দেখ। এ ভালোবাসায় বিচারবুদ্ধির অপেক্ষা নেই, আগন্তুক কোনো বিষয়ের উপর নির্ভর করারও দরকার নেই। এ নিজের রসেই রসময়। এ স্বতঃস্ফূর্ত, নিজেই নিজে সুসম্পূর্ণ। বাসনান্তর নেই, ভুক্তি-মুক্তি নেই, অভিসন্ধি নেই—নীরবে গোপনে বসে শুধু আনন্দাশ্রুবর্ষণ। আর এমন মজা, একবার এ ভালোবাসা জাগলে জীবনে সমস্ত সদগুণের সমাবেশ ঘটে। ভাগবতী প্রীতিই সর্বগুণৈকনিধানস্বভাবা।

মাটির শালগ্রাম তৈরি করল মৃড়ানী। ধ্যানাবিষ্ট হয়ে পুজো করতে বসল।

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে।

'এ কী অলক্ষুনে কাণ্ড!' সংসার খেপে উঠল: 'মাটি দিয়ে কখনো শালগ্রাম হয়?'

হয়। তেমন আন্তরিকতা তেমন ঐকান্তিকতা নিয়ে ডাকলে মাটিই পাথর হয়ে ওঠে।

'নিশ্চয়ই ঘোর অমঙ্গল হবে সংসারের। বংশের একমাত্র তুলাল অবিনাশেরই না কিছু হয়ে বসে।'

কিন্তু কোনো তাড়নে-তর্জনে নিষ্ঠা থেকে স্খলিত হবার মেয়ে নয় মৃড়ানী।

এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সে তার মা গিরিবালার কাছেই পেয়েছে।

মাতামহের সম্পত্তি পেয়েছিল গিরিবালা। তার একক উত্তরাধিকার। আত্মীয় স্বজনদের তা মনঃপূত হবে কেন? তারা নানা উপায়ে গিরিবালাকে অপদস্থ করতে চাইল, ফেলতে লাগল নানান তুর্বিপাকে। কিন্তু গিরিবালা এতটুকু টলল না। আমার মহামায়া আছেন। তাঁর হাতের খড়গ আমাকে রক্ষা করবে।

আত্মীয় না কালসাপ। তারা মামলায় ফেলল গিরিবালাকে। গিরিবালা তাতেও পেছপা নয়। লড়াই আমি ছেড়ে দেবনা কিছুতেই। আমি ভক্ত হয়েছি বলে নির্বল নই। আমার স্বত্ব আমি ছাড়বনা। আমি আমার সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকব।

পার্বতীচরণ বললে, 'কী দরকার এসব ঝামেলায়। চল তুজনে কাশী চলে যাই।'

'না, না, কাশী পালাব কেন! দেখি না কী হয়।' স্বামীকে আশ্বস্ত করল গিরিবালা: 'তুমি ভয় কোরো না। অসত্য ও অবিচারকে পারব না মেনে নিতে। ভয় কি, অশিবদলনী তুর্গা আমাদের সহায়।'

গিরিবালার আকর্ষণ বিষয়ে নয়, সত্যের স্থাপনায়।

মামলায় জিতল গিরিবালা কিন্তু বড় ছেলে নবকুমার মারা গেল। আঁচলে মুখ ঢেকে রইল গিরিবালা। শোকে-কালি-ঢালা বিষণ্ণ মুখ লুকোবার জন্যে নয়, পূজাধ্যানে দিব্যানন্দের জ্যোতি ফুটেছে, তাই গোপন করবার জন্যে। লোকে না ভুল বোঝে। এত

বড় একটা শোক পেয়েছে গিরিবালা, অথচ দেখ, হাসছে, আনন্দে ঢল-ঢল মুখ করে আছে। পাগল হয়ে গেল বোধহয়।

আবার ছেলে হল গিরিবালার। নাম অবিনাশ। মেয়েও হল একটি। বিপিনকালী।

অযোধ্যা থেকে একজন জোরদার সাধু এসেছে। সে বললে, আরো একজন আসছে তোমার ঘরে। কিন্তু এইটুকু আয়তনে তাকে কুলোবে না।

গভীর রাত্রে জপধ্যান করছে গিরিবালা। হঠাৎ তার অপরূপ দর্শন হল। দেখল নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। হঠাৎ তার বুকে এসে একটা জ্যোতির তীর বিদ্ধ হল। অন্ধকার গলে গলে বইতে লাগল আলোর জলপ্রপাত। সমস্তই এখন ঢেউ-খেলানো আলোর সমুদ্র। তরঙ্গ ধীরে-ধীরে স্থির হল, উত্তাল সংহত হল। ধীরে-ধীরে মূর্তিগ্রহণ করলে। এ যে দেখি আলোর জননী মহারাত্রি মহামায়া। কোলে তার এক শিশুকন্যা। গিরিবালার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে হাত বাড়িয়েছে।

আশ্চর্য, গিরিবালা শিশুটিকে টেনে নিল তার বুকের মধ্যে।

ধ্যান ভেঙে গেল। মহামায়াও নেই, শিশুও অগোচর।

এর পরেই ১২৬৪ সালে জন্মাল মৃড়ানী।

মায়ের শুধু কালীতে ভক্তি, মেয়ের রতি যেমন কালীতে তেমনি কৃষ্ণে। আর কৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ। সুতরাং প্রাণের আকূতি তীব্রতম শ্রীগৌরাঙ্গে।

রাগানুগা ভক্তি-প্রচারের জন্যে এসেছেন গৌরহরি। আর সেই ভক্তির উন্মেষ নাম-সঙ্কীর্তনে। আর আপনি আচরণ না করলে অন্যকে শেখানো যায় না। দেওয়া যায় না ব্রজপ্রেম। তাই পথে-পথে নাম বিলোচ্ছেন মহাপ্রভু। ভক্তভাব ধরে কৃষ্ণের জন্যে কেঁদে মরছেন।



36441
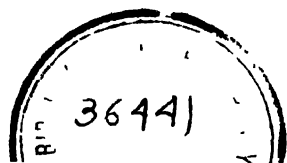
গুরুছাড়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু কৃষ্ণের কৃপা হলে পাঠিয়ে দেন গুরু, নয়তো স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অন্তর্যামী-রূপে নিজেই গুরু সাজেন।

কিন্তু মৃড়ানীর বেলায় নিজেই প্রত্যক্ষ হয়েছেন মানুষ-বিগ্রহরূপে।

এ গুরু কে? কে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে দীক্ষা দিল নিজের থেকে? তার ব্যাকুলতার উত্তরে এ কী করুণা! এ কী প্রতিধ্বনি! এ কী দ্বারমোচন!

বৃন্দাবন থেকে কে এক ভক্ত-মেয়ে এসেছে। কেউ চেনে না, আতিথ্য নিয়েছে বাড়িতে। চিরকুমারী, কৃষ্ণে অর্পিতচিত্তা। যতক্ষণ স্তব্ধ থাকে, জপধ্যান করে আর যখন কথা বলে, বলে শুধু কৃষ্ণকথা। স্তব্ধতায়ও কৃষ্ণ, মুখরতায়ও কৃষ্ণ। আবেশে যে আবেগেও সে।

'এ কী, ঘরের মেঝেতে এ পাথরের টুকরোটা এল কী করে?' ক্ষিপ্রহাতে মৃড়ানী কুড়িয়ে নিল টুকরোটা। 'দেখ দেখ কী সুন্দর, কেমন কুচকুচে কালো। এ এল কোত্থেকে?'

গাঢ় চোখে আবিষ্ট হয়ে দেখছে মৃড়ানী, সেই ভক্ত-মেয়ে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এল। জিজ্ঞেস করলে, 'খুকি, তুমি আমার ঠাকুরকে দেখেছ?'

'ঠাকুর?' বিহ্বল চোখে তাকাল মৃড়ানী। অলক্ষ্যে হাত চাপা দিল আঁচলে। বললে, 'ঠাকুর কোথায়?'

'ঘরের মেঝেতে তুমি কিছু পেয়েছ কুড়িয়ে?' আঁচলঢাকা হাতটা টপ করে চেপে ধরল সে মেয়ে।

'পেয়েছি। সে তো একটা পাথরের টুকরো।'

'কী আশ্চর্য, ঐ তো আমার দামোদর, আমার নারায়ণশিলা।'

ভক্ত-মেয়ে বললে, 'কী ভয়ানক দুষ্টু দেখেছ! কখন ঠিক টুপ করে লাফিয়ে পড়েছে।'

'তার মানেই তোমার কাছে থাকতে চায় না।' মৃড়ানী মধুরমুখে হাসল।

'কিন্তু আমি থাকি কী করে?' মৃড়ানীর হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল ভক্ত-মেয়ে: 'আমার ঠাকুর আমাকে ফিরিয়ে দাও। দিয়ে দাও বলছি।' গায়ে বেশি জোর, মৃড়ানীর হাত থেকে শিলাখণ্ড ছিনিয়ে নিল মেয়ে। বুকের উত্তাপে তাকে চেপে ধরে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আর অসতর্ক হব না। মুঠো শিথিল করব না। অগোচরে যেতে দেব না পালিয়ে!

নিজের ঘরে গিয়ে কাঁদতে বসল ভক্ত-মেয়ে।

ডাকাল মৃড়ানীকে।

মৃড়ানী এসে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এখন উনি কাঁদছেন কেন অঝোরে? কী হয়েছে? কী না জানি অপরাধ করেছে মৃড়ানী!

স্নেহের নিবিড়ে ভক্ত-মেয়ে টেনে নিল মৃড়ানীকে। বললে, 'দামোদর তোমার প্রেমে মজেছে।'

'আমার?' মৃড়ানী লাফিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, তোমার। আমার কাছে আর সে থাকবে না। তোমার কাছে থাকবে, তোমার থেকে সেবা নেবে। সে কী দেখেছে তোমার মধ্যে সেই জানে।'

মৃড়ানী আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠল।

'জানো, শিলা আমার অঞ্চলের নিধি, আমার ইহ-পর সর্বকালের সর্বস্ব।' ভক্ত-মেয়ে কাঁদতে লাগল অঝোরে: 'সেই শিলা তোমার হাতে সমর্পণ করলাম। কত বড় ভাগ্যবতী তুমি। তুমি দামোদরের নির্বাচিতা।'

মৃড়ানী রেখে দিল দামোদরকে। আদর করে ডাক-নাম রাখল দামু।

আমি কৃষ্ণে তদাত্মিকা। আমার গৃহাসক্তি নেই। আমার কৃষ্ণাসক্তি। কৃষ্ণে আমার অচ্যুতা মতি। সম্পদে হোক বিপদে হোক আমি যেন ভগবানে সৌহৃত্যবদ্ধ থাকি। যেন বিচলিত বিকারপ্রাপ্ত না হই। আমি যেন কৃষ্ণের প্রীতিচ্ছবি হয়ে বিরাজ করতে পারি।
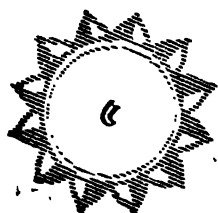
নিমতেঘোলার সেই সাধুকে গিয়ে বললে হয়, আমি দামোদর পেয়েছি।

খবর নিয়ে জানল, সাধু এ তল্লাটে নেই, কোথায় চলে গিয়েছেন।

চল কালনায় যাই। ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন করিয়ে আনি। মৃড়ানীর দাদা অবিনাশ আর খুড়ো করালীচরণ নিয়ে গেল মৃড়ানীকে।

মৃড়ানীর কাহিনী সব শুনলেন বাবাজী। আনন্দে গদগদ হয়ে বললেন, 'এ তো মহাভাগ্যের কথা। শুধু ও-মেয়ের নয়, তোমাদের সকলের। তোমাদের বংশের।'

'ভাগ্য বলছেন ?' করালীচরণ মানতে চায়না।

'বহুজন্মের সুকৃতি। তা না হলে ও ভাবে গুরুকৃপা আসে ?' বাবাজী উদার দৃষ্টিতে আশীর্বাদ ঢাললেন: 'কত বড় আধার! বিশুদ্ধতার প্রতিমূর্তি। তা না হলে দামোদর ওর হাতের সেবার জন্যে কাঙাল হয় ?' তাকালেন মৃড়ানীর দিকে। 'আর তোমার ভয় নেই, গুরুর কৃপা সম্বল করে এগিয়ে পড়ো। এগিয়ে পড়ো।'

কেঠো বন নিয়ে যাবে চন্দনবনে। চন্দনবন থেকে রুপোর

খনি সোনার খনি, মনিমুক্তোর মাঠ। তুমি জানো না কোথায় প্রাপ্তির শেষ পরিধি। শুধু এগিয়ে পড়ো।

কালনা থেকে নবদ্বীপে এল।

সেখানে দেখা পেল চৈতন্যদাস বাবাজীর। তার কান্তারতি। মহাপ্রভুকে তিনি পতিভাবে ভজনা করছেন। ধরেছেন নারীবেশ। নারীসুলভ ভাবভঙ্গি।

কান্তারতিই পরাকাষ্ঠা। 'কান্তাগণের রতি পায় মহাভাবসীমা।' দ্বারকার মহিষীরাও কৃষ্ণকান্তা, ব্রজগোপীরাও কৃষ্ণকান্তা। মহিষীদের রতি সমঞ্জসা, অর্থাৎ তোমারও সুখ হোক আমারও সুখ হোক। ব্রজগোপীদের রতি সমর্থা, আমার সুখ চাইনা, শুধু কৃষ্ণের সুখ হোক। আর কৃষ্ণসুখবাসনাই প্রেম।

সমর্থা রতিই সান্দ্রতমা। এই রতি সমস্ত আর্য পথ, সমস্ত বেদধর্ম বিধিধর্ম লোকধর্ম ত্যাগ করবার সামর্থ্য দেয় বলেই এ সমর্থা রতি। অকুণ্ঠিত চিত্তে কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণসুখ সম্পাদন করেই তারা পরিতৃপ্ত। তাদের তৃপ্তি কৃষ্ণসুখের তাৎপর্যে। কৃষ্ণসুখ ছাড়া তাদের আর কোনো সন্ধিৎসা নেই নেই ভোগস্পৃহা।

সেই ভাবেই সেবা করো দামোদরকে।

'আমি কান্তা সেজে আমার পতিদেবতা গৌরহরিকে ডান পাশে নিয়ে শুই।' বলছেন চৈতন্যদাস: 'সারারাত প্রিয়তমকে বুকে করে রাখি। পাশ ফিরলে পাছে গৌরহরির ঘুমের ব্যাঘাত হয় আমি পাশ ফিরি না। এ পর্যন্ত কোনোদিন শুইনি বাঁ পাশে।'

ডান পাশে ঘা হয়ে যায় বাবাজীর।

এবার পাশ ফিরে শোন। ডান পাশটাকে বিশ্রাম দিন।

'আমি আমার প্রিয়তমের থেকে মুখ সরিয়ে নিতে পারব না। ঘুমে জাগরণে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকব নিষ্পলক।' বললেন

চৈতন্যদাস, 'এ তুচ্ছ হাড়মাসের খাঁচা গলে পচে খসে যাক, কী এসে যায়!'

বৃন্দাবন থেকে ডাক এল, বাকি জীবন ব্রজধামে কাটিয়ে দাও।

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন বাবাজী। ব্রজেশ্বর আমার হৃদয়েশ্বর হয়ে নদীয়ায় বিরাজ করছেন। নদে ছেড়ে আমি যাব কোথায়?

'নদের চাঁদের কান্তা আমি, কান্ত আমার গোরা।' গানের এই কলিই গাইতেন বাবাজী। যেদিন তিরোহিত হন সেদিন মিল দিলেন গানে : 'আমার সাধন হল সারা, আমার ভজন হল সারা।'

সবই তো পেলাম, গুরু পেলাম, দামোদর পেলাম, কিন্তু দর্শন-স্পর্শন কোথায়? তবে এ পাথর কি নিতান্তই পাথর? কথা কয় না কেন? কেন বাঁশি বাজায় না? কেন শোনায় না নুপূরের নিক্কণ? তবে আমার ঠাকুর কি বোবা? মমতাহীন?

বুঝেছি সহজে ধরা দেবেনা। বেশ, মৃড়ানীও সঙ্কল্পে দৃঢ়ীভূত হল, আমি ছাড়ব না কঠোর করতে। আমি তপস্যান্বিত হব। নিয়ত তপস্যায় দৃঢ়াসীন থেকে এই পাথরকে বিগলিত করব, মূককে মুখর করব, অচলকে চঞ্চল করে তুলব। কোনো ত্যাগ স্বীকারে আমি পেছপা হব না।

কোমর বাঁধল মৃডানী।

ভগবানে অনন্যযুক্তা অব্যভিচারিণী ভক্তিই মৃড়ানীর একমাত্র শক্তি। আর এরই থেকে তার সংসারসংসর্গে অনিচ্ছা, ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ে নির্মম বৈরাগ্য।

গিরিবালা ঠিক করলেন মেয়েকে নিয়ে তীর্থে যাবেন। যদি তাতে মেয়ের চিত্তের কিছু উপশম হয়।

প্রথমে গঙ্গাসাগর, পরে কাশী, সবশেষে মথুরা বৃন্দাবন।

মৃড়ানী ভাবে, মহতের যে কৃপা সে তো ভগবানেরই কৃপা।

তাঁর কৃপাতেই তো ভক্তি, তাঁর কৃপাতেই তো ব্যাকুলতা। তিনি যাকে জাগিয়ে রাখেন সেই তো পারে জেগে থাকতে। যাকে মনে করিয়ে দেন সেই তো তাঁকে মনে করে। সাধনা করে কি ঈশ্বর পাওয়া যায়? এমন কি সাধনা আছে যার সাহায্যে তাঁকে কৃপা করতে বাধ্য করানো চলে? কিছু নেই, কিছু নেই। শুধু তাঁর জন্যে ক্লান্ত হয়েছি এ দেখে যদি তাঁর কৃপা হয়!

যাত্রার কয়েকদিন আগে গিরিবালা অসুখে পড়লেন।

'আমি আর তবে কী করে যাই।' ছোটবোন্ বগলাকে বললেন, 'তুই মান্তকে দেখিস। উড়নচণ্ডি মেয়ে।'

শুধু বগলা নয়, বিহারীলাল, বগলার স্বামী আর করালীচরণ. গিরিবালার দেওর, সঙ্গে রইল।

আঠারো বছরের মেয়ে তখন মৃড়ানী। ঈশ্বরের রশ্মিলেখা। যে দেখে তারই মনের গভীরে একটি স্তব গুঞ্জরন করে উঠে।

সাগরসঙ্গমে এসে মৃড়ানীর আনন্দ দেখে কে! ডানামেলা পাখির মত সে উড়ে বেড়াতে লাগল।

দুদিন সকলে ঠিক চোখ রেখেছিল তার উপর। তৃতীয় দিন সে আর নেই। উধাও হয়ে গিয়েছে। পালিয়েছে হলদে পাখি।

'সে কি, মান্ত কোথায় গেল?' বগলা উতলা হয়ে উঠল।

'কোথায় আর যাবে?' বিহারীলাল চাইল আশ্বস্ত করতে। 'এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করছে আর কি।'

'ওগো না, ঘরে তার ঠাকুর নেই, পুজোর জিনিসপত্র নেই - দেখ, দেখ, কোথায় গেল।'

আর কোথায় গেল! বিহারী আর করালী খুঁজতে বেরুল। দলের আর সকলে হতবুদ্ধি। কোথায় গেল মৃড়ানী? রূপের জ্বলন্ত ফোয়ারা, কোথায় নাজানি কী পড়ল অঘোরে!

কোতোয়ালের ঘাঁটিতে খবর দাও।

মৃড়ানীর তবু উদ্দেশ নেই। করালী বিহারী মাথায় হাত দিয়ে বসল। গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল বগলা।

আরো দুদিন উদ্ভ্রান্তের মত খোঁজাখুঁজি করে বাড়ি ফিরল সকলে।

'কই আমার মান্তু কই?' জিজ্ঞেস করলেন গিরিবালা।

নীরবে নত মুখে কাঁদতে লাগল বগলা।

'তার মানে?' করালীর মুখের দিকে উৎসুখ চোখে তাকালেন গিরিবালা।

'সে নেই।'

'নেই মানে? মারা গেছে?'

'না, না, ছি, ষাট, মারা যাবে কেন?' ত্রস্তব্যস্ত হয়ে করালী বললে, 'সে পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে? তাই বলো।' হাঁপ ছাড়লেন গিরিবালা: 'সংসারে তাহলে মন তার রইলনা কিছুতেই?'

আর কোনো অর্থই ভাবতে পারেন না গিরিবালা। তাঁর মেয়ে মহাবলসম্পন্না প্রচণ্ডা চণ্ডিকা। কারু সাধ্য নেই তার অনিষ্ট করে। সে কৃষ্ণের চিদানন্দলতিকা, ভক্তিতে বিপুল শক্তিমতী। সে নিশ্চয়ই পরম ঋদ্ধি লাভ করবে। জীবনে পরম ঋদ্ধি কী? ঈশ্বরকৃপা। তাই লাভ করবে মৃড়ানী।

'ভেবেছিলাম, সংসার না করলেও স্বগৃহে থেকেই সাধন ভজন করবে। সেই সাধনেই লাভ করবে তার অভীষ্ট। কিন্তু না, সে অন্য ধাতুতে তৈরি, কঠিনতর পরীক্ষায় তার নিমন্ত্রণ। তাই সে থাকল না আমাদের স্নেহবন্ধনে।' গিরিবালার চোখ কান্নায় ভরে এল: 'সে ডাক শুনল গভীর গহনের। হিমালয়ের।'

অভিভাবকরা নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না। তীর্থে তীর্থে লোক পাঠালেন। খবরের কাগজে ঘোষণা করলেন পুরস্কার।

কিন্তু কোথায় মৃড়ানী? কোথায়?
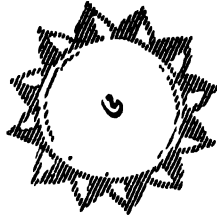
তড়িৎলেখা এ তন্বী তরুণী কে?

পশ্চিমা সাধুদের দলে এসে ভিড়েছে মৃড়ানী। দলে কজন সন্ন্যাসিনী আছে, হয়তো এই তার আশ্বাস।

'তোমরা কোথায় চলেছ মা?' আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মৃড়ানী।

'হরিদ্বার।'

'সেখান থেকে?'

'হৃষীকেশ।'

চণ্ডীমামার মুখে হিমালয়ের অন্ধিসন্ধি সব শোনা, লুব্ধ চোখে ফের প্রশ্ন করল মৃড়ানী: 'সেখান থেকে?'

'কেদার-বদরী।'

'আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।'

'তুমি?'

সকলে অবাক মানল। কিন্তু স্থির চোখে তাকিয়ে দেখল এ তরুণবল্লরী আসলে ভক্তিকল্পলতিকা। আসক্তির নয় বিরক্তির, বাসনাশূন্যতার প্রতিমূর্তি। দুই চোখে অমিত সাহস ও সঙ্কল্পের ঔজ্জ্বল্য। আর যা কিছু লুব্ধতা সমস্তই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির জন্যে।

'তোমার কে আছে?'

'শুধু কৃষ্ণজী আছেন।' বুকে ঝোলানো দামোদরশিলা দেখাল মৃড়ানী।

সকলের চক্ষুস্থির।

'সঙ্গে জিনিস কী আছে?'

'শুধু এই ঝুলি।' কাঁধে ঝোলানো ঝুলির দিকে ইঙ্গিত করল মৃড়ানী।

'কী আছে ওর মধ্যে?'

'এই দেখ না।' হাসল মৃড়ানী। ঝুলি খুলে ধরল।

ভিতরে দুখানি পট। একখানি কালীর আরেকখানি শ্রীগৌরাঙ্গের। চণ্ডী আর ভাগবত। আর স্বল্প সামান্য দুখানি শাড়ি—এটা-ওটা।

'তুমি আমাদের গৌরীমায়ী। চলো আমাদের সঙ্গে। সাধুর দল উদার সৌহার্দ্যে সংবর্ধনা করল।

'উজ্জ্বলগৌরবর্ণা, তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি, মহাবিদ্যাবিনোদিনী—সকলে গৌরী বলবে না তো কী! মা, তুমি চলো, তুমি আমাদের সমস্ত যাত্রার শুভদাত্রী হবে, তুমিই নাশ করবে সমস্ত শত্রুপুঞ্জ, জয় করবে আঘাত-সংঘাত, তুমিই সর্বসিদ্ধিবরেশ্বরী।

'কিন্তু যাবে যে তোমার স্বামীর অনুমতি আছে?' সন্ন্যাসিনীদের কেউ জিজ্ঞেস করল মৃড়ানীকে।

মৃড়ানী হাসল। বললে, 'নিশ্চয়ই। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কি বেরুতে পারি ঘর থেকে?'

'কী যে বলো! তোমার স্বামী তোমাকে ছেড়ে দিল?'

'ছেড়ে দেবে কেন?' আবার হাসল মৃড়ানী: 'স্বামী আমার সঙ্গেই আছেন।'

কী হেঁয়ালি বলে মেয়েটা! স্বামী যে তার দামোদর, পুরট-সুন্দরদ্যুতি গৌরহরি, তা ওরা কী করে বুঝবে?

পাহাড়ী মেয়ের মত বেশভূষা করে নিল মৃড়ানী। আর তাকে কে পায়! কে চেনে! কে ধরে!

একটি ঘরছাড়া বাঙালি মেয়ে এমনি করে একদিন বেরিয়ে

পড়ল তার পরমতমের সন্ধানে। দুরবগাহের অভিসারে। কয়েকজন ভিন্নভাষাভাষী অনাত্মীয় সহচরের সঙ্গে।

এমন কথা ইতিহাসের জানা ছিল না।

কোষমুক্ত শানিত অসির মত উজ্জ্বল, ভোরের শিশিরের মত পবিত্র, সমস্ত দেহমনে এক নির্বিচল উৎকণ্ঠা, কতক্ষণে দেখতে পাব সেই পরমসুন্দরকে। কবে শুনতে পাব সেই অম্লান বংশীধ্বনি? কবে, কবে?

কখনো বা পায়ে হেঁটে কখনো বা ট্রেনে এগুতে লাগল যাত্রীরা। কত দূর হরিদ্বার!

কষ্টকে কষ্ট বলে মানছে না মৃড়ানী, ক্ষুধাকে ক্ষুধা বলে। কোথায় স্নিগ্ধ গৃহচ্ছায়া, আর কোথায় প্রকৃতির রুদ্র রোষ! কোথায় অলস সুখস্বপ্ন আর কোথায় এই যুদ্ধযাত্রা। 'সর্বেষুকালেষু মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ।' তাই। সর্বদা ঈশ্বরকে চিন্তাও করব আবার যুদ্ধও করব। বুকেও ধরব আবার পথেও চলব। অভ্যাস করে করে চিত্তকে অনন্যগামী করব, যোগযুক্ত হব ঈশ্বরে। তখন কোথায় আমার অনাহার কোথায় আমার পথক্লেশ!

পথে-পথে নানা তীর্থ সেরে তিন মাসে পৌঁছল এসে হরিদ্বার। তারপর হৃষীকেশ থেকে হিমালয়-অভিযান। বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, ঈশ্বরে সমাহিতচিত্ত, প্রাণে অক্ষয় সুখ নিয়ে এগিয়ে চলল মৃড়ানী। যদি পড়তে হয় পড়ব, মরতে হয় মরব, তবু পথ ছাড়ব না, সরে দাঁড়াব না। এই প্রতিজ্ঞাই একমাত্র প্রেরণা। কর্ম তো বন্ধন নয়, ফলাকাঙ্ক্ষাই বন্ধন। ঈশ্বর তো শুধু পথের শেষে নয়, পথে পথে পায়ে পায়ে।

মৃড়ানী এখন সমস্ত বন্ধনবেষ্টনীর বাইরে। আত্মচেষ্টাই অভ্যাস-যোগ। এই আত্মচেষ্টাতেই আত্মশক্তির স্ফুরণ ঘটবে। আর এই আত্মশক্তির স্ফুরণই তো ভগবৎকৃপা।

দেবপ্রয়াগ রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে কেদার-বদরী দেখে এল মৃড়ানী। হরিদ্বারে ফিরে আবার গেল জ্বালামুখী, সেখান থেকে অমরনাথ। শ্রমে শীতে, অনাহারে কী নিদারুণ কষ্ট, তবু মৃড়ানী সঙ্কল্পে শিথিল হবে না। রুদ্ধ দ্বারে করে যাবে করাঘাত। কপাট উৎপাটন করবে।

কেউ বলত, এত শীত পারবে না সইতে, সমতলে নেমে যাও। না, নামব না, কেন নিজেকে দীনহীন ক্ষীণ ভাবব? কেন ভাবব আমি নিঃসহায়? আমার সমস্ত শীতের উত্তাপ সমস্ত পিপাসার পানীয় আমার অন্তরেই বিরাজ করছেন।

পাহাড়ী মেয়েরাই মৃড়ানীর স্নেহস্থল। কত দিন জুটিয়ে এনেছে ফল-দুধ, হিমে নিশ্চল হয়ে গেলে কতদিন নিয়ে গেছে তাদের বস্তিতে, সেবা করে চাঙ্গা করে তুলেছে।

এ স্নেহ কার? এ সেবা কে করে?

একবার এখন যদি বেশবাস দেখ মৃড়ানীর। মাথার সেই দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ চুল নির্মমের মত কেটে ফেলেছে, সোনার বরণ গায়ে মাটি আর ছাই মেখেছে, নিজেকে ঢেকেছে গৈরিকে। আর একমনে প্রার্থনা করেছে, ভগবান, আমার এ দৈহিক রূপ ছারখার করে দাও। তোমার রূপে রূপময়ী করো, তোমার বিভায় বিভান্বিতা।

কখনো বা আলখাল্লা পরে পাগড়ি মাথায় দিয়ে পুরুষ সাজে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'গৌরদাসী কি মেয়ে? ও তো পুরুষ। ওর মত কটা পুরুষ আছে? মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয়, সে কখনো মেয়ে নয়। সেই তো পুরুষ।'

জয়রামবাটিতে হঠাৎ এক সাধু এসে উপস্থিত। পরনে গেরুয়া গায়ে আলখাল্লা মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি। হাতে লাঠি। সঙ্গে অনুরূপ সাজে কিশোর এক চেলা।

ঘোর-ঘোর সন্ধেয় মা-ঠাকুরানীর দুয়ারে এসে দাঁড়াল।

'দেখ গো দিদি তোমার কোন ভক্ত এসেছে।' ছোটভাই অভয় বলে উঠল : 'কোনো মাদ্রাজী ভক্ত হয়তো।'

বার বাড়িতে দাঁড়াল না সাধু। চেলাকে সঙ্গে নিয়ে সটান ঢুকে পড়ল অন্দরে।

ও মা, কী দুঃসাহস!

দুঃসাহস বলে দুঃসাহস। দাওয়ায় বসে ছিল অভয়ের বউ, তাকে লক্ষ্য করে হাত পেতে ভিক্ষে চাইল সন্ন্যাসী।

'আ মরণ! ভিক্ষের আর জায়গা মিলল না!' অভয়ের বউ গালমন্দ করে উঠল: ভর-সন্ধেয় গেরস্তবাড়িতে ভিক্ষে চাইতে এসেছ? বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারো না? একেবারে অন্দর-মহলে! এ কোন দেশী সাধু তুমি?'

কোনো তিরস্কারই গ্রাহ্যের মধ্যে আনছে না সাধু। বরং, কী অভিসন্ধি কে জানে, গুটিগুটি এগিয়ে আসতে লাগল।

'ওগো ও ঠাকুরঝি, শিগগির এস, কোত্থেকে একটা জোয়ান বেটাছেলে অন্দরে এসে ঢুকেছে।' তারস্বরে আপ্রাণ চেঁচিয়ে উঠল অভয়ের বউ।

ত্রস্তে-ব্যস্তে ছুটে এল সবাই। মাঠাকরুনও বেরুলেন ঘর থেকে।

'কে তুমি?'

সাধু নীরবে এগিয়ে এসে মার পায়ের ধুলো মাথায় নিল।

তবু মা চিনতে পারছেন না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন সবিস্ময়ে।

একটানে মাথার পাগড়িটা খুলে ফেলল সন্ন্যাসী। সমস্ত স্তব্ধতাকে ভেঙে-চুরে হেসে উঠল উচ্চরোলে।

'ওমা, গৌরদাসী!' মা গালে হাত দিয়ে অবাক মানলেন: 'আমি যে সত্যি চিনতে পারিনি। আর আশ্চর্য, খুকিকে, দুর্গাকেও পারিনি চিনতে। ধন্যি মেয়ে বাপু তোমরা।'

দিকে দিকে হাসির রোল পড়ে গেল।

গৌরী ছোট মাসীকে বললে, 'ভর সন্ধেবেলা কি বিদেশী সাধুকে এমনি করেই গেরস্ত বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে হয়?'

এবার কলকাতায়। তেমনিধারা সন্ধ্যায় এক গৃহস্থবাড়িতে হঠাৎ ঢুকে পড়েছে গৌরী। এবার সন্ন্যাসী সেজে নয়, সাহেব সেজে।

'কোই হ্যায়?' হাঁক দিয়েছে পরুষকণ্ঠে।

ডাকাত না গুণ্ডা—ও কে ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে? না কি গারদছুট পাগল? অন্দরমহলের মেয়েরা থাক-থাক চেঁচিয়ে উঠল: ওগো কে কোথায় আছ?

গৌরী ধিক্কার দিয়ে উঠল। বললে, 'তিন তিনটে ভরবয়সের মানুষ নিজেদের বাড়িতে অন্দরমহলে বসে আছ। হাতের কাছেই ঘটি-বাটি বঁটি-কাটারি রয়েছে। চিৎকার করার আগে না হয় অচেনা বেটাছেলের দিকে একটা কিছু ছুঁড়েই মারতে। আমার দেশের মেয়েরা এত ভয় পায় কেন? তিনটে মেয়েতে মিলে কি একটা লোককে তাড়ানো যায় না? শুধু লক্ষ্মীটি হলেই চলবে না, সময় কালে কালীও হতে হয়।'

গৌরীমাকে চিনতে পেরে মেয়েদের তখন উপশম!

গৌরীর এত দীপ্তি এত সাহস কিসে? স্বয়ং ভগবান তার স্বামী এই অন্তরঙ্গ অনুভূতিতে।

লক্ষ্মী কী বলে স্তব করছে ভগবানের?

ভগবান হৃষীকেশকে নমস্কার করি। তুমি ক্রিয়াজ্ঞান ও বিষয়ের অধিপতি। তুমি বেদময়, অন্নময়, অমৃতময়। তুমি সর্বময়। সমস্ত সাহস ও সামর্থ্যের কারণ। কান্ত ও কাম তোমার মূর্তি। তোমাকে নমস্কার। তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর। তোমাকে আরাধনা করে নারী অন্য পতি প্রার্থনা করে কিন্তু তার সেই পতি

তার প্রিয় পুত্র ধন ও পরমায়ু রক্ষা করতে পারে না কারণ তারা পরবশ। আসল পতি কে? যে স্বয়ং নির্ভয় এবং যে ভয়গ্রস্তকে রক্ষা করতে পারে সেই আসল পতি। প্রভু, এরই জন্যে এক তুমিই সকলের পতি। তুমিই নির্ভয়, তোমার সুখই কারু অধীন নয়। যে স্ত্রী তোমার পদপঙ্কজের সেবামাত্র প্রার্থনা করে, অন্য ফল যার অভিলষিত নয় সে সর্বফলই প্রাপ্ত হয়। আর যে কামিনী অন্য ফল প্রার্থনা করে তোমার অর্চনা করে, তুমি তাকে তার আকাঙ্ক্ষিত ফলমাত্র দান কর। পরে ভোগে তা বিনষ্ট হলে সে অনুতাপ করতে বসে। হে অচ্যুত, তোমার করকমল থেকে যাবতীয় অভীষ্ট বর্ষণ হয়, সেই করকমল তুমি ভক্তজনের মাথায় কৃপা করে স্থাপন কর। দয়া করে আমার মাথার উপরেও রাখো একবার। আমাকে শুধু আদর নয় আমাকে অনুগ্রহ করো।

লক্ষ্মীর মত মৃড়ানীও জেনেছে, ভুবনের পতি ভগবানই একমাত্র পতি। তিনিই অজিত-অচ্যুত শ্রীহরি।
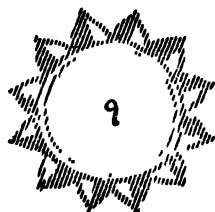
বনের নির্জনে পথ হারিয়েছে মৃড়ানী। পাহাড়ী নদীর উপরে ওটা কী? ওটা বরফের সাঁকো। নদীর ওপারে যেতে হলে এই সাঁকোটা পার হতে হবে। তাই যাব ওপারে। থামব না। ফিরে যাব না। এগিয়ে গেলে যদি শুধু মৃত্যুকেই দেখা যায়, তাই, মৃত্যুকেই দেখব।

সাঁকোর মাঝামাঝি এসেছে, সাঁকো ভেঙে পড়ল। মৃড়ানী পড়ে গেল নদীতে। ভেসে চলল খরস্রোতে। কী ধারালো জল,

ঠাণ্ডায় কনকন করছে। আর নদীর পাড় কোথায়? উঃ, কত উঁচু! সেখানে পৌঁছুব কী করে? মৃড়ানী চোখ বুজল। এই বুঝি মৃত্যু এসে নিয়ে গেল ছিন্ন করে। ইষ্টনাম জপ করতে লাগল। কই স্রোত আর টানছে না কেন? স্থির, পাথর হয়ে গেল নাকি? চোখ চাইল মৃড়ানী। দেখল নদীর উপর পাড় ঘেঁষে বিরাট এক স্তূপ বরফ ভেঙে পড়েছে। তাইতে স্রোত আটকে গিয়েছে, টানতে পারছে না। ঐ বরফের স্তূপের গা বেয়ে বেয়ে অতি কষ্টে উঠল মৃড়ানী, পার পেল।

সেদিন তুষারঝঞ্ঝার মধ্যে পড়েছিল। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল মুখ থুবড়ে। তক্ষুনি, কোত্থেকে কে জানে, মাথায় ঝুঁটি বাঁধা উলের ঘাঘরা পরা এক মেয়ে এসে হাত ধরে তাকে টেনে তুলল। বয়ে নিয়ে পৌঁছে দিলে এক পাহাড়ী বস্তিতে, তারপর কোন দিক দিয়ে কোথায় চলে গেল কেউ দেখল না।

এমনি কত ক্লেশ সহ্য করেছে, কত দৈন্য-দুর্ভাগ্য। তবু একবারও মনে হয়নি ফিরে যাই মার অঞ্চলে, সংসারচ্ছায়ায়। বিষয়ে বাসনায় ডুবে থাকি। যেমন আর সকলে নামে-কামে আরাম খোঁজে আমিও তেমনি স্তিমিত হয়ে যাই। না, উপায় নেই; গৌরীর ে। কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম। প্রগল্ভা ভক্তির এমনই গুণ বিষয়ভোগে আবদ্ধ লোকও বিষয়ভোগে অভিভূত হয় না। আগুন সমৃদ্ধ হতে হতে যখন ঊর্ধ্বশিখ হয় তখন যেমন নিমেষে কাষ্ঠস্তূপকেও ছাই করে ফেলে তেমনি ভক্তি উদ্দীপ্ত হতে হতে সমস্ত বিষয়বাসনাকেই উচ্ছেদ করে দেয়।

মৃড়ানী যে সেই উদ্দীপ্তা অগ্নিশিখা— বিশোকা জ্যোতিষ্মতী।

বনের মধ্যে ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা, কেদারনাথের পথ খুঁজে পাচ্ছে না মৃড়ানী। পথে কোনো যাত্রী নেই, সঙ্গী একমাত্র নিঃসঙ্গতা। তারপর ভর দুইদিন আহার নেই। কোথায় যায়,

কে পথ দেখায়, কে আলো ধরে! একটা পাথরের উপর শুয়ে পড়ল মৃড়ানী। নিদ্রার ছদ্মবেশে যদি মৃত্যু আসে তো আসুক। চরাচর-ঢাকা অন্ধকারের মতই বুঝি তার উদার মমতা।

তন্দ্রার আবেশের মধ্যে মৃড়ানী টের পেল কে এক পাহাড়ী নারী, বৃদ্ধা, তার শিয়রের কাছে বসেছে, মাথায় রেখেছে তার স্নেহসিক্ত করতল। মায়ের কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞেস করছে, 'এ লালি কহাঁ যাওগী ?'

কোথায় আর যাব ? কেদারনাথ। পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

'তু ইধার কাঁহে আয়া ? আও মেরা সাথ।'

আমিই কি এসেছি ভুল-পথে ? প্রভুই আমাকে এনেছেন। আবার প্রভুই নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে।

দু মিনিটেই কেদারের মন্দিরের দরজায় পৌঁছে গেল মৃড়ানী। এ কি, দুদিন ধরে কাছে-পিঠে এত ঘোরাঘুরি করেছি, ঘুণাক্ষরেও তো বুঝিনি কাছেই মন্দির রয়েছে লুকিয়ে। প্রভুর কৃপা না হলে বুঝি কাছের জিনিসও খুঁজে পাওয়া যায় না। সন্নিহিতকেও মনে হয় দূরস্থিত। 'তদ্দূরে তদন্তিকে।' আবার যা দূরস্থিত তাই সমীপস্থ।

মন্দির দেখে আনন্দে বিভোর মৃড়ানী। কিন্তু মন্দিরে আগে ঢুকবে, না, যে সহায়িকা তাকে নিয়ে এসেছে মন্দিরে তাকে আগে ধন্যবাদ দেবে, বুঝি বা একটু দ্বিধা উপস্থিত হল। মন্দিরের দিকে কয়েক পা এগিয়েই পিছু হটল, ছুটল সেই বৃদ্ধার দিকে। কিন্তু কই, কোথায় সে ? পলকে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। 'মা' 'মা' বলে ডাকতে লাগল মৃড়ানী। কোনো প্রতিধ্বনি মিলল না।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল মৃড়ানী। মহামায়া তাকে দেখা দিয়েও ধরা দিলেন না। এ দুঃখ অসীম হয়ে রইল।

আরো কত কৃচ্ছ্র, কত ধৈর্যের পরীক্ষা। এ পথ তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারার

মত হুর্গম। তবু এ পথেই পরম অমৃতের অনুভব। তাই ছাড়ব না, ফিরব না, বসব না বিশ্রাম করতে। মৃড়ানী বলসাধিকা। আর বলবান ছাড়া কার সাধ্য সে অমৃতত্ব অধিকার করে।

নিচে গঙ্গার ধারে এ কী অদ্ভুত মন্দির। মন্দিরের গায়ে বেলগাছ, তাতে পাতা খসে পড়ছে অথচ সে পাতা স্রোতে ভেসে যে কোথায় যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। ভীষণ কৌতূহল হল, মন্দিরে ঢোকা যায় কী করে ? উপর থেকে কোনো দরজার আভাস মিলল না। শুধু একটা গর্ত চোখে পড়ল। এই গর্তটাকে বড় করা যায় কিনা। পাথর দিয়ে ঠুকতে লাগল মৃড়ানী। গর্ত খানিক চওড়া হল, কিন্তু তার ভেতর দিয়ে গোটা শরীরটা ঢুকবে বলে ভরসা হল না। আরো ঠোকো, আরো আঘাত করো, সঙ্কীর্ণ করে প্রশস্ত করো। মোক্ষদ্বারের কপাট মোচন করো। করাঘাতই তো পূজার একমাত্র মুদ্রা।

গর্তটা ক্রমে ক্রমে বড় হল। যা করেন দামোদর, মৃড়ানী পাথর ধরে ধরে কঠিন ক্লেশে নামল মন্দিরে।

সে এক অপরূপ দৃশ্য ! মন্দিরের মাঝখানে শিবলিঙ্গ আর তাকে ঘিরে এক দঙ্গল সাপ। পাশেই একটি জ্বলন্ত দীপ।

এতটুকু ভয় পেলনা মৃড়ানী। নাগাঙ্গাভরণ সর্পোপবীতীকে তন্ময় হয়ে প্রণাম করল। প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।

সাপেরাই ভয় পেল। মহাদেবকে ছেড়ে মন্দিরের এক কোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে রইল।

এতক্ষণে বুঝল বেলপাতা কোথায় যায়। বেলপাতা যাই জলে পড়ছে তক্ষুনি জাহ্নবী তা হুহাতে জড়ো করে মহাদেবকে অঞ্জলি দিচ্ছে।

হাতভরা পাতা আর জল নিয়ে মৃড়ানীও প্রাণেশ-জীবেশকে অর্চনা করল।

স্তবপাঠ করতে লাগল :

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগবরং বন্দে পশূনাং পতিং ॥
বন্দে সূর্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্ ॥

সাপের লেখা বাঘের দেখা। সেদিন বাঘ পড়ল সামনে। রাতে চটিতে বিশ্রাম করছে মৃড়ানী। ঘুমোয়নি, বসে জপ করছে। অচেনা জায়গায় রাতে সে ঘুমোয় না, মৌনে জপ করে নয়তো বা মুখরে কীর্তন করে রাত কাটায়। সেদিন রব উঠল বাঘ এসেছে। আসুক। কাঠপাতা জড়ো করে মৃড়ানী আগুন করল। কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে বাঘ। আরো কাঠ দাও, আগুনের তেজ বাড়াও। লেলিহান আগুন দেখে বাঘ থমকে দাঁড়াল। দাঁড়াও, তোমাকে দেখাচ্ছি। বাঘকে লক্ষ্য করে জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল মৃড়ানী। বাঘ চম্পট দিল।

এমনি নিজের মধ্যে জ্বালাও আত্মশক্তির হুতাশন, সাপবাঘ ঘেঁষতে পাবে না। জাগাও যোগবল, সমস্ত বিপাক পরাভূত হবে।

সাপ-বাঘ দূরে থাকে কিন্তু মৃগশিশু দাঁড়ায় গা ঘেঁষে, লেহন করে।

সেদিন হিমালয়ের নির্জনে নিমগ্ন হয়ে মধুর স্বরে নাম গান করছে মৃড়ানী, দূর থেকে তা শুনতে পেয়ে থেমে পড়েছে হরিণ। ধীর পায়ে কাছে চলে এসেছে। আয় তো আয়, একেবারে কোলের কাছটিতে বসে পরম স্নেহে গা লেহন করছে। মৃড়ানী তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নাম শুনে হরিণের দুই চোখ সজল হয়ে উঠল। কঠোরের কঠোর কোমলের কোমল, মৃড়ানী দুষ্ট-নিসূদনী আবার পরমা শান্তিময়ী পরিজন-পালয়িত্রী লক্ষ্মী।

অহিংসা অভ্যাস করো। অহিংসাই শান্তির উপায়। বৈরাগ্যই

অভয়—এই জপেই শান্তি। ভগবানের নামামৃত পান করো, ক্ষুধার ভয় নেই। মনে করো ভগবান তোমার সঙ্গেই ফিরছেন, নেই তাই দস্যুভয়। পথে ভুল যত বড়ই হোক জানবে ভগবানের ক্ষমা ও কৃপা তার চেয়েও বড়।

উঠে চলে যাচ্ছে মৃড়ানী, হরিণশিশু তার পিছু নিয়েছে। শেষকালে হরিণ নিয়ে সংসার করতে হবে নাকি? একরাশ ঘাস-পাতা যোগাড় করল মৃড়ানী, আয়, খা, হরিণশিশুকে তা খেতে দিয়ে সরে পড়ল গুটি গুটি।

আর যাচ্ছি না মায়ার কারাগারে। সীমার বাঁধ ভেঙে সত্তাকে অসীমে মিলিয়ে দেবার সাধ আমার। আমার এক বুদ্ধি, ব্রহ্মনিশ্চয়াত্মক। বুদ্ধিই জাগ্রত হোক।

বদরীনারায়ণের কাছে এক সাধুর সঙ্গে দেখা। অনন্ত মৌনে অবস্থান করছেন। কেউ কাছে গেলে ঢিল ছুঁড়ে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন, তফাৎ রাখছেন। আমাকে থাকতে দাও আমার অখণ্ড বোধে।

মৃড়ানী ঠিক করল আমি ওঁর কাছে যাব। ঢিল ছুঁড়লেও সরে যাব না। দেখি কী করে কী বলে।

মৃড়ানী কাছে যেতেই সাধু হাসলেন। ঢিল ছুঁড়লেন না। নিজের দুখানি করতল পাশাপাশি রাখলেন যুক্ত করে, তাতে তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে।

ইঙ্গিতের অর্থ বুঝে নিতে দেরি হলনা মৃড়ানীর। তার মানে আত্মদর্শন করো। যখন দেখবে হাতের দর্পণে তোমার নিজের ছবি ফুটে উঠেছে, তখনই তোমার আত্মদর্শন। ভগবদ্দর্শন।
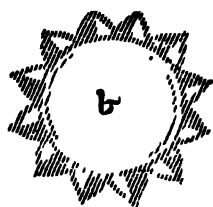
ঘুরতে-ঘুরতে বৃন্দাবনে এসেছে মৃড়ানী।

আর হঠাৎ সেখানে পিসতুতো কাকা শ্যামাচরণ মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা

'এ কে, মান্তু না?' ধরে ফেললেন শ্যামাচরণ।

পিছন ফিরে তাকাল মৃড়ানী। এ কে ডাকে পিছন থেকে? পুরোনো নাম ধরে?

কী আশ্চর্য সুন্দব হয়েছে দেখতে! শ্যামা কাকা অপ্রলক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল মৃড়ানীর দিকে। মাথার চুল ছাঁটা, পরনে পবিত্র গেরুয়া, স্থির বিদ্যুৎলেখার মত দাঁড়িয়ে। জীবনের যেন এক উজ্জ্বল উর্জস্বল ঘোষণা। আমি বদ্ধ কূপের জন্যে নেই, আমি মুক্ত আকাশের জন্যে। আমি দেহে প্রেরিত নেই, আমি আত্মায় প্রেরিত।

'আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে চল।' শ্যামাচরণ তার পথ আটকাল।

'না।' রুখে দাঁড়াল মৃড়ানী।

ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মত আবার বললে, যা নিয়ে আমি অমৃত হব না তা দিয়ে আমি কী করব?

হ্যাঁ, অমৃতেই তো মানুষের আদিম অধিকার। আর অমৃতই তো আনন্দ।

সুখবাসনাই জীবের স্বরূপ। জীব যত কিছু কাজ করে একমাত্র সুখের উদ্দেশ্যেই করে। কিন্তু সুখ কী, সুখ কোথায়? যা

অল্প যা ক্ষণিক তা কি সুখ হতে পারে? দুঃখের শেষ আছে কিন্তু সুখের শেষ নেই। তাই যা অশেষ যা ভূমা তাই সুখ। যখন সুখের বাজারে বেরিয়েছি তখন ঠুনকো জিনিস কিনব কেন? যা সবচেয়ে টেঁকসই, সবচেয়ে মজবুত তাই কিনব। যে সুখ থেকে-থেকে নয়, থেমে-থেমে নয়, যা অনবচ্ছিন্ন, তাই আমার লক্ষ্যের, আমার সন্ধানের। তাই ভূমাই বিজিজ্ঞাসিতব্য।

সেই ভূমা সেই অপরীসীম আনন্দ কী? রসো বৈ সঃ। রসং হোবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। পরব্রহ্মই রসস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ। তাকে পেয়েই মানুষ আনন্দিত। সেই আনন্দলাভই মানুষের পরম কাম্য পরম পুরুষার্থ। আর যতক্ষণ মানুষের ভয়, উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা ততক্ষণ কে বলবে মানুষ সুখী? একমাত্র ব্রহ্মের আনন্দকে জানলেই মানুষ নির্ভয়, মানুষ নিরুদ্বেগ, মানুষ চিন্তাবিলাপবিহীন।

সুতরাং সেই আনন্দই আমাকে দাও যা পেলে আর আরোর তৃষ্ণা থাকে না। যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

আমি কেন কম নিয়ে ঠকব? আমরা কি এখানে ঠকতে এসেছি, হারতে এসেছি? ছাড়তে এসেছি আমার হকের হিস্‌সা? আমি কি প্রবঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাতের দলে? আমি কি পরিত্যক্ত?

তবু নিদারুণ পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন শ্যামাচরণ। না, তোকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে।

মথুরায় বাসা নিয়েছেন শ্যামাচরণ। মৃড়ানী তাঁর কথার অবাধ্য হতে পারল না। তাঁর আশ্রয়ে গিয়ে উঠল। কিন্তু মন রয়েছে ঈশ্বরের দিকে। সঙ্কোচের দিকে নয় বিস্তারের দিকে। আর যা বৃহত্তম, বিস্তৃততম, তাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মং তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

কাকিমা আর খুড়তুতো বোনেরা ঘিরে রাখল মৃড়ানীকে। কোথায় যাচ্ছ, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব। যদি রাত জাগো, না ঘুমোও, আমরাও তোমাকে পাহারা দেব পালা করে।

মৃড়ানী টের পেল তাকে কলকাতায় পাঠাবার জন্যে সঙ্গোপনে প্রস্তুতি চলছে। মনে মনে হাসল মৃড়ানী। চারদিকের দেয়াল দিয়ে বাঁধবে তুমি মুক্ত মাঠের সমীরণকে ? ঝড়ের আকারে বেরিয়ে ভেঙে দেবে সে প্রাচীরের অবরোধ।

আবার পালাল মৃড়ানী।

কাকীমা আর বোনেরা দুপুরে বুঝি ঘুমুচ্ছে শিথিল হয়ে। টুক করে দরজার খিল খুলল মৃড়ানী। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল পথে। তারপরে ছুট দিল।

আমাকে কে ধরে! আমি কৃষ্ণের অভিসারিকা। আমি তন্ময়ী তদেকপ্রেরিতা। আমি কৃষ্ণান্বেষিণী ব্যাকুলতা। কার সাধ্য আমাকে আটকায়।

যমুনার কাছে এক নির্জন জায়গায় লুকিয়ে রইল মৃড়ানী।

একদিন একটি চারুদর্শন বালক তার কাছে উপস্থিত।

'তুমি কে ?' মৃড়ানী চমকে উঠল।

'আমি গাঁয়ের এক রাখাল। গরু চরাই।'

'তা এখানে, আমার কাছে এসেছ কেন ?'

'তোমার জন্যে একটি খবর আছে।' মৃদু হাসল রাখাল।

'কী খবর ?'

'তোমাকে ধরতে আসছে।'

'কে ধরতে আসছে ?' ত্রস্তব্যস্ত হল মৃড়ানী।

'তোমার বাড়ির লোক। তুমি পালাও। আর এতটুকুও দেরি কোরো না।'

'কোথায় পালাব ?'

বালক আবার হাসল : 'তার আমি কী জানি!'

'তুমি কী করে জানলে, আমি এখানে লুকিয়ে আছি ?' মৃড়ানী আকুল হয়ে বললে, 'কী করে জানলে আমার পালাবার দরকার ?'

'তারই বা আমি কী জানি!' বালক চলে গেল, হারিয়ে গেল বনের মধ্যে।

অবিলম্বে জয়পুরের পথে বেরিয়ে পড়ল মৃড়ানী। এসেছিল তো ধরা দিল না কেন? বললে, চলো চলো এগিয়ে চলো, কেঠো বনেই দিন কাটিও না, চন্দনের বনের দিকে চলো। সেখান থেকেই আবার সোনার খনির দিকে। চলো চলো শুধু চলো।

জয়পুরে এল মৃড়ানী। সেখান থেকে পুষ্কর, প্রভাস, দ্বারকা।

দ্বারকার পথে, সুদামাপুরীতে, কৃষ্ণমন্দিরে আশ্রয় নিল মৃড়ানী। কেন কে জানে মন্দিরটি ভারি ভালো লাগল তার, ইচ্ছে হল এখানে কদিন থেকে যায়।

এ মন্দির সেখানকার রাজার তৈরি। তার কানে উঠল এক দিব্যশক্তিসম্পন্না সাধুমায়ী মন্দিরে এসে উঠেছেন। মনে হচ্ছে তাঁর হাতে আছে বুঝি বা অসাধ্যসাধনের মন্ত্র।

রাজা মৃড়ানীকে দেখে মুগ্ধ হল। বললে, 'এ ভাঙা মন্দির আপনাকে মানায় না। আপনি আমার প্রাসাদে চলুন। আমার প্রাসাদের এক অংশ আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি।'

মৃড়ানী হাসল। বললে, 'প্রাসাদের চেয়ে মন্দিরই আমার ভালো। রাজভোগের চেয়ে প্রসাদকণিকাই কাম্যতর।'

'কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আপনি পূর্ণ করুন।'

'বলুন।'

'আমি নিঃসন্তান।' রাজা বললে করজোড়ে। 'আমাকে কিছু দৈব ওষুধ দিন আর আমাকে আশীর্বাদ করুন। আমার যেন একটি ছেলে হয়।'

গম্ভীর হল মৃড়ানী। বললে, 'আমি কোনো ওষুধ বিষুধ জানি না।'

'না, জানেন। আপনি গোপন করছেন।'

'আমি শুধু এক ওষুধ জানি। তা হচ্ছে গোবিন্দে আত্মসমর্পণ— প্রেমভক্তি।' মন্দিরের বিগ্রহের দিকে তাকাল মৃড়ানী: 'তুমি এর চেয়ে সুন্দর ছেলে আর কোথায় পাবে? কায়মনে তোমার গোপালকেই ভালোবাসো। তার সেবা করো। সেই সেবাই পরম প্রাপ্তি, পরম বিত্ত।'

'মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥'

কৃষ্ণকে আপনার বলে ভাবো। সে তোমার লাল্য পাল্য, তোমার অনুগ্রহের তোমার অনুকম্পার যোগ্য বলে মনে করো। ভগবান ঐশ্বর্যের বশ নয় মাধুর্যের বশ। মমত্ববুদ্ধির ঘনতায়ই কৃষ্ণ ঘনিষ্ঠ। যে কৃষ্ণ আমার পতি সেই কৃষ্ণ আবার কারু সন্তান। 'আমাকে তো যে-যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে-সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥' তোমার সন্তান ধনে মানে যশে বিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ হোক সর্বপূজ্য হোক কিন্তু তার প্রতি তোমার সর্বদাই লাল্য বুদ্ধি, কখনোই গৌরববুদ্ধি নয়। সুতরাং এই গোপালকেই তোমার পুত্র করো। তাকে কোলে নিয়ে বসো। তাকে খাওয়াও-পরাও, দোল দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াও।

পাশের গাঁয়ে কলেরা লেগেছে। তুমি ওদিকে যেওনা।

'না, আমি যাব। আর্ত রুগ্ন বিপন্নের সেবা করব।' কোমর বাঁধল মৃড়ানী: 'নইলে আমার কিসের কৃষ্ণভজন।'

যেখানে যত ডাক্তার ছিল আশে-পাশে একত্র করল মৃড়ানী। চিকিৎসাবাহিনী সংগঠন করল। ব্যাধি যাতে ছড়াতে না পারে তার ব্যবস্থা প্রণয়ন করল। সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দিয়ে করাও যাগযজ্ঞ, করাও শাস্ত্রপাঠ।

গ্রামে স্বয়ং দেবীর আবির্ভাব হয়েছে, কয়েকদিনেই মহামার শান্ত

হল। যে দিগবস্ত্রা মুক্তকেশী সেই আবার মরণভয়হরা বাঞ্ছিতার্থ-প্রদায়িনী।

গ্রাম আর কিছুতেই ছাড়তে চায়না মৃড়ানীকে। তুমিই সংসার-সারভূতা জগদ্ধাত্রী। তুমিই লোকপাবনী আনন্দপ্রতিমা। তুমি এখানে থেকে যাও।

না, আমি থামবার জন্যে নই, আমি চলবার জন্যে।

দ্বারকায় রণছোড়জীর মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল মৃড়ানী। এই সেই মীরাবাইয়ের রণছোড়। তার সেই নাগর গিরিধারী। 'মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরা ন কোই।' এই গিরিধারীকেই যে স্বামী বলে মেনেছিল, বলেছিল একমাত্র গিরিধারীই আমার স্বজন। গান গাইতে গাইতে এই গিরিধারীর বিগ্রহেই লীন হয়ে গিয়েছিল।

হে প্রিয়তম, যদি তুমি আমাকে শুদ্ধা বলে জানো একনিষ্ঠা বলে জানো, তবে আমাকে তুমি তুলে নাও। কৃপা করো, তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই। অন্নে রুচি নেই, চোখে নিদ্রা নেই, দিনে-রাতে পলে-পলে দেহ শুধু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। হে মীরার প্রভু, গিরিধর নাগর, এই যে তোমার সঙ্গে আমার মিলন এতে আর বিচ্ছেদ ঘটিও না।

বৃন্দাবনে এসে রূপ গোস্বামীর দর্শন ভিক্ষা করেছিল মীরা। গোস্বামী বলে পাঠালেন, আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী, আমি প্রকৃতি সম্ভাষণ করিনা।

মীরা বলে পাঠাল, আমি তো জানতাম বৃন্দাবনে একমাত্র বৃন্দাবনচন্দ্রই পুরুষ আছেন। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পুরুষ আছে বলে তো আমার জানা নেই।

মন্দিরে ভোগারতি শেষ হয়েছে। জপে বসবে, হঠাৎ মৃড়ানী দেখল মন্দিরের মাঝখানে একটি শ্যামল বালক খেয়ে না আঁচিয়ে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। মৃড়ানী ভাবল পুজুরীর ছেলে বোধহয়। আর এ দেশের ছেলেদের বোধহয় মন্দিরে বসেই প্রসাদ নিতে বাধা নেই।

কিন্তু যাই বলো মৃড়ানীর মন এই অনাচার বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়। সে পুজুরীর কাছে নালিশ করতে যাবে, দেখতে পেল স্বয়ং সেই পুজুরীই সস্নেহে জল ঢেলে ছেলেকে আঁচিয়ে দিচ্ছে। আর ছেলেটার কী স্পর্ধা, হাতমুখ না মুছেই সটান উঠে বসল গিয়ে সিংহাসনে।

মন্দিরের দোরগোড়ায় মৃড়ানী মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

বিরহজ্বরজীর্ণা গোপীদেব মতই অন্তরে কাঁদছে মৃড়ানী। হে উদ্ধব, কৃষ্ণের সেই ললিত গতি, উদার হাস্য, বিশদ দৃষ্টি আর মধুর বাক্য আমাদের চিত্ত হরণ করেছে, অতএব কেমন করে তাকে ভুলে থাকব? হে কৃষ্ণ, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ, হে আর্তিনাশক, হে গোবিন্দ, একবার এসে দেখে যাও আমাদের। সে কেন আসবে! আমরা বনবাসী, আমরা তার কোন অভিলাষ পূর্ণ করব? সে এখন শত্রুসংহার করে রাজ্য পেয়েছে, রাজকন্যাদের বিয়ে করে সুখে বসবাস করছে, অমিত ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সে দীনদরিদ্রের ঘরে আসবে কেন? তবু, যদিও আমরা জানি, আশা ত্যাগ করাই পরম সুখ, তবু আশা ছাড়তে পারছি কই? হায়, কৃষ্ণেব প্রতি আমাদের এমন আশা যে সেই আশাকেও ত্যাগ করা যায় না। সে না আসুক, তবু আমৃত্যু আমরা গোবিন্দপদবীই ভজনা করব।

পুজুরী ছুটে এল মৃড়ানীর কাছে। সুস্থ করে স্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলে, 'কিছু কি দর্শন হল, মা?'

'না, না, কোথায় দর্শন?' পাশ কাটাল মৃড়ানী।

শুধু ক্ষণকালিক একটু আভাস দিয়ে কী হবে? কবে মায়ার

আবরণের বাইরে ভগবানকে দেখতে পাব? শুধু অন্তর্নেত্রে দর্শন নয়, চাই বহিঃসাক্ষাৎকার।

ধ্রুব যখন কৃষ্ণকে দেখল, বললে, তোমার সাক্ষাৎকারের যে সুখ তা সমুদ্রতুল্য, তার তুলনায় ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদ।

নারদ নিরন্তর ভগবানের গুণকীর্তন করছেন। সে-কীর্তনের সময় ভগবান আবির্ভূত হচ্ছেন হৃদয়ে। শুধু অন্তরে দেখে তৃপ্তি নেই। তাই বারে বারে নারদ দ্বারকায় আসছে কৃষ্ণকে বাইরে দেখবে বলে।

তাই তো এই প্রার্থনা :

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে॥
সমুখ আকাশে চরাচরলোকে
এই অপরূপ আকুল আলোকে
দাঁড়াও হে,
আমার পরান পলকে পলকে
চোখে চোখে তব দরশ মাগে॥'

মৃড়ানীরও সেই আকূতি: তুমি আমার চোখের সামনে স্থির হয়ে স্পষ্ট হয়ে স্পর্শসহ হয়ে দাঁড়াও। আমার অল্পে সুখ নেই অস্পষ্টে সুখ নেই শুধু অনুভবে সুখ নেই। তুমি প্রত্যক্ষ হও গোচরীভূত হও নেত্রপথবর্তী হও।
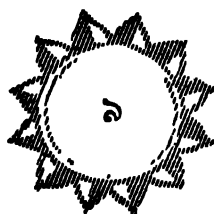
গুজরাটে এসেছে মৃড়ানী।

কিন্তু এ তীর্থের নাম কী? প্রাণ কেন দুঃখভারাক্রান্ত হচ্ছে? কেন দুচোখ ছাপিয়ে জল নামছে অনর্গল? কেন কার জন্যে এই বিরহক্লেশ?

খবর নিয়ে জানল, এ তীর্থের নাম প্রভাস। এইখানেই কৃষ্ণের লীলাসম্বরণ।

যদুকুল ধ্বংস হল। পৃথিবীর ভার নেমে গেল। বলরাম সমুদ্রতীরে পরমপুরুষের ধ্যান করতে বসলেন। আত্মাতে আত্মা যোজনা করে ত্যাগ করলেন মর্তলোক। বলরামের নির্বাণ দেখে শোকে স্তব্ধ হলেন কৃষ্ণ। অশ্বত্থ গাছের নিচে চতুর্ভুজ হয়ে বসলেন। মেঘের মত শ্যামবর্ণ, অথচ তাঁর পাবকপ্রভায় সব দিক আলো হয়ে উঠল। সুন্দর সুমঙ্গল কমল নয়ন স্ফূর্তিমান, মুখমণ্ডল সুনীল চিকুর-পাশে অলঙ্কৃত, মকরকুণ্ডলশোভিত, কিরীটে কটকে অঙ্গদে কৌস্তুভে হারে নুপূরে বিভূষিত। নিজের দক্ষিণ উরুতে কোকনদসদৃশ রক্তবর্ণ বাম পা রাখলেন। সেই পা মৃগমুখাকৃতি দেখে জরা নামে ব্যাধ মৃগভ্রমে তা বাণবিদ্ধ করল। পরমুহূর্তেই দেখল মৃগ নয়, চতুর্ভুজ পুরুষ। ভূমিতে পড়ে গেল ব্যাধ, কাঁদতে লাগল, যাঁর চরণে মানুষের অজ্ঞানান্ধকার নাশ হয় আমি তাকেই বিদ্ধ করেছি। হে উত্তমশ্লোক এই পাপাচারী লুব্ধককে সত্বর সংহার করুন। কৃষ্ণ বললেন, তুমি

ভয় কোরো না। এ আমার মায়াকৃত, তুমি সুকৃতীদের গতি লাভ করে স্বর্গে যাও। ইচ্ছাশরীরী কৃষ্ণের জন্যে গরুড় চিহ্নিত রথ এল, অবিজ্ঞেয়গতি কৃষ্ণ স্বধামে চলে গেলেন।

বিরহব্যথা অসহ্য হল মৃড়ানীর। প্রভাস ছেড়ে আবার চলে এল বৃন্দাবন।

কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী মৃড়ানী। 'ননদী, বল্ গে নগরে। রাই কলঙ্কিনী ডুবেছে কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে॥' আর কিছু গ্রাহ্য করি না, হিসেবে আনি না, কৃষ্ণদর্শন আমার চাইই চাই। ব্রজের বস্তু যে কৃষ্ণ, চাই তার অসমোর্ধ মাধুর্য-দর্শন। সে দর্শনের জন্যেই আমার উৎকণ্ঠাময়ী লালসা।

"যার পুণ্যপুঞ্জফলে সে মুখ দর্শন মিলে
দুই অক্ষ্যে কি করিব পান।
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালোভ পিতে নারে মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দন॥"

গোপিকাকারা মৃড়ানী বৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে সে অনাবৃত্ত অবাধ দর্শন খুঁজে ফিরছে। কখনো আত্মহারার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে যমুনাপুলিনে। কোথায় গৌরহরি? কোথায় গিরিধারী বংশীধর? কোথায় তুমি মঙ্গলায়তন, ক্লেশনাশন কেশব? হে হৃদয়স্থ জনার্দন, একবার ইন্দীবরশ্যামল রূপে দেখা দাও।

'কস্তূরীতিলকং ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে নবমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কনম্।
সর্বাঙ্গে হরিচন্দনঞ্চ কলয়ন্ কণ্ঠে চ মুক্তাবলি
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল-চূড়ামণিঃ॥'

'ঠাকুর, তোমার জন্যে আমি ঘর ছেড়ে এসেছি।' মৃড়ানী কাঁদতে লাগল আকুল হয়েঃ 'তুমি যদি দেখা না দাও তবে আমি কী দেখব, কাকে বা মুখ দেখাব?' ভক্তানুকম্পায়ই তো তুমি গৃহীত-

মূর্তি। আমার প্রতি কেন কৃপা করবে না? তবে তোমার নাম দীনবন্ধু কেন, কেন তুমি সর্বার্তিশমন, প্রাণপ্রেষ্ঠ? তোমাকে যে সকলে সহজসুন্দর বলে, সুলভসুশীল বলে, কেন বলে?'

কোনো সাড়া নেই শব্দ নেই, নেই এতটুকু আশ্বাসের আভাস। সে দয়িতই হতে পারে, দয়ালু হতে পারে না।

মৃড়ানী ভাবল তা হলে চলে যাই বৃন্দাবন ছেড়ে। তাতে সে নির্দয়ের তো ভারি এসে যাবে। সে তেমনি বাঁশি বাজিয়ে যাবে, সর্বপ্রাণীকে চঞ্চল করে ফিরবে। যেখানে যাবে সেখানেই সেই আকর্ষক, সেই মধুগন্ধী মধুস্মিত। পালিয়ে যাবনা এ দেহই বিসর্জন দেব। সে দেহ রেখে লাভ কী যে দেহ দেখতে পারেনা কৃষ্ণকে, পুণ্যপীযূষপুঞ্জদৃষ্টিকে।

গভীর রাত্রে ললিতাকুণ্ডের পারে এসে দাঁড়াল মৃড়ানী। স্থির করল ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে।

ঝাঁপ দিতে যাবে, এমন সময় কী ঘটল কে জানে। অন্ধকার জ্বলে উঠল আলো হয়ে। নবকিশোর নটবর কৃষ্ণ, সেই গোপবেশ বেণুকর, দাঁড়ালেন মৃড়ানীর সামনে। মৃড়ানী মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

কোথায়, কোথায় অদৃশ্য হলে? কমলনয়ন, মেঘাভ, বৈদ্যুতাম্বর, জ্ঞানমুদ্রাঢ্য, বনমালী কোথায় তুমি? লীলাপুরুষোত্তম, কবে আবার দেখতে পাব তোমাকে?

পরদিন ভোরে ব্রজনারীরা দেখতে পেল কে একটি মেয়ে ললিতাকুণ্ডে পড়ে আছে। গৌরগৌরবোজ্জ্বলা এ কে সুন্দরী! কেউ কেউ চিনত, আরে, এ যে আমাদের মৃড়ানী, কৃষ্ণ ছাড়া যার লক্ষ্য নেই, বাক্য নেই, ক্ষুধা নেই, রুচি নেই। কৃষ্ণৈকনিষ্ঠা।

ধরাধরি করে তারা নিয়ে গেল তার আশ্রয়ে। সুস্থ করে তুলল।

সেই থেকে মৃড়ানীর কী হল কে বলবে। কখনো কাঁদে কখনো হাসে কখনো হাতে তালি দিয়ে গান গায়। কখনো বা

বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে জড়বৎ হয়ে থাকে। কখনো বা নির্ঝরধারে অশ্রু বিসর্জন করে। আর কোনো দিকে দৃষ্টি নেই, শুধু কৃষ্ণ-কৃষ্ণ। 'কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সবধাম। কৃষ্ণের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥'

বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটে বাড়িতে শ্রীশ্রীমারও সেই সমাধি-অবস্থা। ধ্যান ভাঙবার পর বলছেন যোগেন-মাকে, 'ও যোগেন, আমার হাত কই, পা কই ?' যোগেন-মা হাত-পা টিপে-টিপে বলতে লাগল, 'এই যে পা এই যে হাত।' তবু দেহবোধ তখুনি-তখুনি আসে কই ?

আরেকবার বলরামবাবুর বাড়ির ছাদে সমাধিভঙ্গের পর বললেন যোগেন-মাকে : 'দেখলুম কোথায় চলে গেছি। সেখানে সকলে আমায় কত আদর-যত্ন করছে। যেন খুব রূপ খুলেছে আমার। দেখি ঠাকুর রয়েছেন সেখানে। তাঁর পাশে আমায় বসালে—সে যে কী আনন্দ বলতে পারিনে। একটু হুঁশ হতে দেখি শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি কি করে ঐ বিশ্রী শরীরটায় ঢুকব ? ওটাতে ঢুকতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। অনেক পর ওটাতে ঢুকতে পারলুম, তখন দেহে হুঁশ এল।'

জয়রামবাটি থেকে মা ফিরছেন কলকাতায়, সঙ্গে গৌরীমা ও আরো অনেক সন্তান। বিষ্ণুপুরে এলে এক ভক্ত ব্রাহ্মণ মাকে প্রণাম করে বললে, 'মা, তোমার অপেক্ষায় আমি কতকাল বসে আছি। একবার গরিবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দাও মা।'

সন্তানেরা আপত্তি করল। খেয়ে-দেয়ে তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরতে হবে। এখন কোথাও যাওয়া-টাওয়া চলবে না।

সেই ব্রাহ্মণ শুনছে না কোনো কথা। একবারটি চলো মা। আমার গরিবের ঘরকে তীর্থ করে দিয়ে এস।

'এখন সময় কই ?' সন্তানেরা প্রবলতর আপত্তি করল : 'ট্রেন কি আমাদের জন্যে বসে থাকবে ?'

ঘোড়ার গাড়িতে করে সসন্তান মা চললেন স্টেশনের দিকে।

সেই ব্রাহ্মণ কাঁদতে-কাঁদতে চলেছে গাড়ির সঙ্গে। এতটুকু তোমার দয়া নেই? আর সকলে তোমার সন্তান আর আমিই তোমার সন্তান নই?

কিন্তু ট্রেন ধরতে না পেলে যে অনেক গোলমাল, অনেক অসুবিধে।

তখন অভিমানে ব্রাহ্মণ যা-তা বলতে লাগল।

'বাবা, আমায় তুমি শেপো না।' বললেন মা-ঠাকরুন। 'সঙ্গে যারা আছে তাদের বলো।'

গৌরীমা মুহূর্তে বুঝে নিল কার কী মনোব্যথা। মাকে বললে, 'মা, তোমার যদি যাবার ইচ্ছে থাকে তো বলো। ব্রাহ্মণের বাড়ি হয়েই যাওয়া যাক। ভক্তের চোখে জল পড়ছে।'

মা তখুনি হুকুম দিলেন: 'গাড়ি ফেরাও।'

'কাজটা কিন্তু মোটেই ভালো হলনা গৌর মা', ভক্ত সন্তান বিরক্ত হল: 'শেষধালে গাড়ি ফেল হবে।'

'হবে না। কিছুতেই না।'

'তুমি বললেই হবেনা?'

'আচ্ছা তুমি দেখে নিও।' দৃঢ়স্বরে বললেন গৌরীমা।

ব্রাহ্মণ পরম আহ্লাদে সপরিকর মাকে গৃহে নিয়ে এল। দেখাল তার নিত্যপূজার দেবীবিগ্রহকে। মা, এই দেখ আমার মৃন্ময়ী।

এই মৃন্ময়ী? ঠাকুর বলেছিলেন, বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ীদেবীকে দর্শন কোরো। আমি দেখেছি। ভারি জাগ্রত।

ফেরবার পথে মা বললেন, 'জানো গৌরমণি, ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন এই দেবীকে দর্শন করতে। কিন্তু কত বছর কেটে গেল দর্শন হয়নি। এবার মা, তোমার জন্যে এটি হল।'

স্টেশনে এসে পৌঁছুল সকলে। কিন্তু ট্রেন কই? ট্রেন চলে গিয়েছে? না, ট্রেন এখনো আসেনি। আধঘণ্টাটাক লেট।

'ভক্তের চোখের জল পড়ছে!'

চোখের জল পড়লে সাধ্য কী তিনি না আবির্ভূত হন!

১০
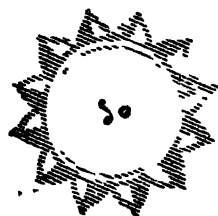
শ্যামাচরণ আবার ধরলেন মৃড়ানীকে।

এবার আর ছাড়ানছোড়ান নেই। এবার তোকে যে করে হোক নিয়েই যাব কলকাতায়। এই ছাখ তোর মা কী লিখেছে।

গিরিবালার কখানা চিঠি পড়তে দিল মৃড়ানীকে। মৃড়ানীব চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, 'চলুন দেখে আসি মাকে।'

কলকাতায় এল মৃড়ানী। বাড়ি পৌঁছেই মার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুই—তুই শান্তু? গিরিবালা যেন সমস্ত আকাশটাকে পেয়ে গেলেন আলিঙ্গনে। এই তুই কী সুন্দব হয়েছিস।

স্ফুরৎকান্তিমতী পবিত্রতা! যেন কৃষ্ণবাঞ্ছার অমেয় পরিপূর্তি। হ্লাদিনী মহাশক্তি।

মার চেহারা দেখেই বুঝল বাবা নেই। দিদিমাও গত হয়েছেন।

সকলে ধরে পড়ল মৃড়ানীকে। বল তোর তীর্থযাত্রার কথা বল।

আমার আবার কথা কী! সর্বত্রই আমার তীর্থ। সর্বত্রই আমার কৃষ্ণসন্ধান। কৃষ্ণজিজ্ঞাসা।

'তোরে বিনয় করি চরণ ধরি বলে দে গো রাই।
হৃদয়ের ধন রতনমণি কোথায় গেলে পাই॥'

গিরিবালাকে বললে, 'মা, শ্রীক্ষেত্রে দেখে আসি পুরুষোত্তমকে।'

'আবার ফিরবি বল?'

'ফিরব।'

সন্ন্যাসিনীকে কে বাধা দেয়? সে যে ভয়ঙ্করী ও ক্ষেমঙ্করী একসঙ্গে। 'চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ।'

মৃড়ানী দেখল পুরুষোত্তমকে আর মনে মনে বিহ্বল হল ভেবে, এই মূর্তিই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে দেখেছেন গৌরহরি। আমার নদীয়াবল্লভ।

মন্দিরের পুজারিরা মৃড়ানীর ভক্তিনিষ্ঠা দেখে অবাক হয়ে গেল। জগন্নাথকে নিজের হাতে ভোগ রেঁধে খাওয়াতে চাও? বেশ তো, রেঁধে আনো, খাবেন জগন্নাথ। শুধু খাবেন না, তোমার হাতের জেনে, খেয়ে, তৃপ্ত হবেন।

তারপরে গান ধরো। কীর্তন করো। করো স্তবপাঠ। ভাগবত শোনাও।

পুরী থেকে বেরিয়ে সাক্ষীগোপাল ভুবনেশ্বর আলালনাথ রেমুণা ঘুরে মৃড়ানী এল কোঠারে। সব দেখলে, কোঠারের শ্যামচাঁদকে দেখে যাও। রাধামোহন বসুর বাড়িতে এই শ্যামচাঁদ। আর এই রাধামোহনের ছেলেই বলরাম।

মা-ঠাকরুনও এসেছেন পুরী। ঠাকুর জগন্নাথ দেখেননি বলে তাঁর একখানি ফোটো বস্ত্রাঞ্চলে ঢেকে এনেছেন। মন্দিরে ঢুকেই আগে সেই ফোটোকে জগন্নাথ দর্শন করালেন ও পরে নিজে দেখলেন।

ছবি আবার কী করে মূর্তিকে দেখে?

'জানোনা বুঝি?' বললেন মা, 'ছায়া-কায়া সমান।'

'আর আপনি কী দেখলেন?'

'জগন্নাথকে দেখলুম যেন পুরুষসিংহ, রত্নবেদীতে বসে আছেন

আর আমি দাসী হয়ে তাঁর সেবা করছি।' বললেন মা, 'আবার কখনো দেখলুম যেন শিব বসে আছেন পুরুষোত্তম হয়ে।'

মা-ঠাকরুন তখন কামারপুকুরে, গৌরীমা দেখতে পেলেন হালদার পুকুরের কাছে গাছতলায় এক সাধু বসে। যেন আর চলতে পাচ্ছেনা সর্বাঙ্গে সেই ক্লান্তির কালি মাখানো।

'এ মায়ি,' গৌরীমাকে ডাকল সাধু, জিগগেস করলে, 'বলতে পারো জগন্নাথ আর কতদূর ?'

'জগন্নাথ ?' থমকে দাঁড়ালেন গৌরীমা।

'হ্যাঁ, আমি স্বপ্ন দেখলুম একজন দীর্ঘকায় পুরুষ আমাকে বলছেন, কেন মিছে পথ হাঁটছিস ? আমিই জগন্নাথ, আর আমি এখানেই আছি।' সাধু করুণনেত্রে তাকাল : 'বলতে পারো সে জগন্নাথ কতদূর ? আর কতটা হাঁটলে সে জগন্নাথের দেখা পাব ?'

গৌরীমা বললেন, 'দাঁড়াও, আমি জেনে আসি।' বলেই মায়ের কাছে এলেন ছুটতে-ছুটতে। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও মা, দেখেছ তোমার কত্তার কাণ্ড। এক সাধুকে এসে বলছেন, কামারপুকুরই শ্রীক্ষেত্র।'

মা বললেন, 'সাধুকে নিয়ে এস এখানে।'

গৌরীমা আবার ছুটলেন সাধুর কাছে। বললেন, 'এখানে এক সাধুমায়ী আছে, তিনি বলে দেবেন সেই দীর্ঘকায পুরুষ কে, কোথায় জগন্নাথ ?'

সাধু এসে দাঁড়াল মায়ের কাছে।

গৃহদেবতা রঘুবীরকে দেখালেন মা। বললেন, 'স্বপ্নে আপনি যাঁর দর্শন পেয়েছেন তিনিই এই রঘুবীর। তিনিই জগন্নাথ।'

'এই রঘুবীর আর জগন্নাথ কি অভেদ ?'

'হ্যাঁ, বাবা, অভেদ।'

'তবে এঁর প্রসাদ পেলে আমার জগন্নাথের প্রসাদ পাওয়া হবে ?'

'নিশ্চয়ই হবে।' মা সাধুর জন্যে উদার হাতে প্রসাদ নিয়ে এলেন।

'তুমি মনে কোনো দ্বিধা রেখো না—দুইই এক।' বললেন গৌরীমা, 'আর এই যাঁকে দেখছ ইনি সাক্ষাৎ কমলা। এর হাতের প্রসাদ পাওয়া জন্মজন্মান্তরের ভাগ্যের কথা।'

প্রসাদকে প্রণাম করল সাধু। স্তোত্র পাঠ করতে লাগল :

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন বসতি লীলা পরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

দাক্ষিণাত্যে তীর্থ করে মাঠাকরুন আরেকবার এসেছেন পুরী। বলছেন, 'অনেক লোক আমাকে দেখতে এসেছিল সেখানে। আমাকে তারা লেকচার দিতে বললে। আমি বললাম, আমি লেকচার দিতে জানিনা। যদি গৌরদাসী থাকত সে দিত।'

পুরী থেকে মৃড়ানী নবদ্বীপ এল। বললে, 'শ্বশুরবাড়িতে এলাম। ন'দে আমার শ্বশুরবাড়ি।'

বৃন্দাবনের মত নবদ্বীপও নিত্যধাম। বৃন্দাবনলীলা আর নবদ্বীপলীলা দুইই নিত্যলীলা। বৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্রনন্দন, নবদ্বীপে শচীনন্দন।

ব্রজলীলার চেয়ে নবদ্বীপলীলা যুগপ্রয়োজনে অধিকতর। ব্রজলীলায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ আর নবদ্বীপলীলায় গৌরসুন্দর কৃষ্ণ আর রাধিকা একসঙ্গে। রাধিকার ভাবকান্তিকে অঙ্গীকৃত না করে নিলে রসনির্যাস আস্বাদন বোধহয় সম্পূর্ণ হয় না। তারই জন্যে নবদ্বীপ-লীলার বিস্তার। তা ছাড়া রাগভক্তির প্রচার তো ব্রজলীলায়

সর্বসাধারণের কাছে হয়নি। এবার গৌরলীলায় লোভের বস্তুটি কী দেখালেন সর্বসমক্ষে? 'আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সভারে॥' আব এই ভজনের আদর্শের স্থাপনের জন্যে নামকীর্তনের প্রচার। আপামর সাধারণকে ব্রজপ্রেম বিতরণ।

পথে যেতে যেতে হঠাৎ যদি নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্তি চোখে পড়ে মৃড়ানী মাথায় ঘোমটা টেনে বসে। নিত্যানন্দ যে বঠ্ঠাকুর।

মহাপ্রভুর মন্দিরে গিয়ে কীর্তনে বিভোর হয়ে থাকে মৃড়ানী। 'না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে।' 'অদ্যাপিহ দেখ—চৈতন্য নাম যেই লয়। কৃষ্ণনামে পুলকাশ্রুবিহ্বল সে হয়॥' 'গৌরনাম অমিয়ধাম, পীরিতি মূরতি গাঁথা।' নামই ফলদাতা। প্রেমদাতা, অমৃতদাতা।

নবদ্বীপ থেকে কাশী। কাশীতে ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দেখল মৃড়ানী। কাশীব 'সচল বিশ্বনাথকে'।

এক মারাঠী মহিলা বিশ্বনাথের পুজো দেয় প্রত্যহ। স্বামীর পেটে ঘা, সেই রোগের নিরসনই তার একমাত্র সঙ্কল্প। কিন্তু অচল বিশ্বনাথের দয়া হচ্ছে কই?

সেদিন মন্দিরে চলেছে মহিলা, বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসছেন ত্রৈলঙ্গ। বিশালকায় বিপুল সন্ন্যাসী নিরর্গল উলঙ্গ।

সঙ্কীর্ণ রাস্তা, মারাঠিনী থমকে দাঁড়াল। স্বামীজিকে লক্ষ্য করে কটূক্তি করে উঠল: 'উলঙ্গই যদি থাকবে তো বনে-জঙ্গলে গেলেই হয়। থাকলেই হয় বাঘ-ভালুকের সগোত্র হয়ে। লোকালয়ে কেন?'

ত্রৈলঙ্গস্বামীর ভ্রূক্ষেপও নেই।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি—বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ স্থিতধী সন্ন্যাসী চলে গেল আপনমনে।

রাত্রে মারাঠিনী স্বপ্ন দেখল, বিশ্বনাথ তাকে বলছেন, তোর সঙ্কল্প আমার দ্বারা সিদ্ধ হবে না। যে উলঙ্গ মহাযোগীকে তুই অপমান করেছিস সেই গুণাতীতের কাছেই তোর ওষুধ আছে।

সর্বনাশ! যাকে অপমান করেছি সে কি অভিমুখী হবে?

কিন্তু অপমান করলেও তো তাঁর কোনো চাঞ্চল্য দেখিনি। তিনি তো শত্রু-মিত্রে শীতে-উষ্ণে সমান, নিন্দায়-স্তুতিতে মানে-অপমানে উদাসীন। তাঁর কাছে হিরণ্যও যা এক মুষ্টি তৃণখণ্ডও তাই। তিনি কৃপা করবেন না তো কে করবেন?

ত্রৈলঙ্গর পায়ে লুটিয়ে পড়ল মহিলা। বাবা, দয়া করুন, আমার স্বামীর প্রাণভিক্ষা দিন।

একমুঠো ছাই দিলেন ত্রৈলঙ্গ।

সেই ছাই মেখেই ভালো হয়ে গেল স্বামী।

মাঠাকরুনও এসেছেন কাশী। বেনীমাধবের ধ্বজায় উঠে সমস্ত কাশীকে সুবর্ণপুরী দেখলেন। শিবের মাথায় জল ঢালছেন, অনাদিলিঙ্গকে দেখতে পাচ্ছেন না, ঠাকুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সব জল ঠাকুরের পায়ের উপর গিয়ে পড়ছে।

ভাস্করানন্দকে দেখলেন। তিনিও দিগম্বর।

ভাস্করানন্দ বললেন, 'শঙ্কা মৎ করো মায়ী। তুম সব জগদম্বা হো, শরম ক্যা?'

মা বললেন সন্তানদের, 'আহা কী নির্বিকার মহাপুরুষ—শীতে-গ্রীষ্মে সমান উলঙ্গ হয়ে বসে আছেন।'

কাশী থেকে মৃড়ানী আবার বৃন্দাবনে চলে এল। কৃষ্ণদর্শন-পিপাসিনী কৃষ্ণান্বেষণকাতরা গোপাঙ্গনা। আর বৃন্দাবন কি শুধু স্থানে? বৃন্দাবন প্রাণে।

'অন্যের হৃদয় মন আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করে মানি,
তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণকৃপা জানি ॥'

বৃন্দাবনে বলরাম বসুর সঙ্গে দেখা। বলরাম বললে, 'দিদি, কলকাতায় ফিরে চলো।'

'কলকাতায়? কেন?'

'দক্ষিণেশ্বরে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। বড় ইচ্ছে করে তাঁকে একবার তুমি দেখ।'

মৃড়ানী হাসল। বললে, 'কত সাধুই তো দেখলাম।'

'না দিদি, এ একেবারে আরেক রকম। এ ঈশ্বরমাতোয়ারা। সনক-সনাতনের মত এঁর ভাব।'

কথাটা গায়ে মাখল না মৃড়ানী।

বলরাম আবার বললে, 'ঐ পরম ভাগবতই স্বয়ং তীর্থ। যাঁর হৃদয়ে গদাধর সদা বিরাজিত তিনিই সমস্ত স্থানকেও তীর্থ করে তোলেন।'

না। কলকাতায় নয়, হৃষীকেশে চলল মৃড়ানী। আরেকবার বদরীনারায়ণকে দেখে আসি। আমার অভিভাবককে।

কিন্তু হৃষীকেশেই এক সাধু তাকে নিভৃতে ডেকে নিল। বললে, 'কলকাতায় ফিরে যা।'

'কেন!'

'তোর মার খুব অসুখ। তোকে দেখবার জন্যে অত্যন্ত কাতর।' বললে সাধু 'যা, পালা। যে মা তোকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে, শিকল কেটে খাঁচার দরজা খুলে উড়িয়ে দিয়েছে অধ্যাত্মের আকাশে, তাকে গিয়ে দেখা দে।'

মা-মা করতে করতে ছুটল মৃড়ানী।

একেবারে কলকাতায়, মার শয্যাপার্শ্বে এসে হাজির হল।

কোথায় তুমি যাবে মা? তুমি তোমার লেখা সেই গানটা ধরো। আচ্ছা আমি গাই তুমি শোনো।

'শ্মশানশবচিতা মুণ্ড সাধনে কি বা প্রয়োজন,
কালী-কালী কব, আনন্দে বেড়াব, কালী প্রেমে হয়ে নিমগন।
অণিমা লঘিমা অষ্ট সিদ্ধি তার, সাধনে নাহিক প্রয়োজন আর
যে ধরে হৃদয়ে চরণ তোমার, করতলে তার এ তিন ভুবন॥'

মাকে সুস্থ করে তুলল মৃড়ানী। আর সুস্থ করেই আবার পালাল শ্রীক্ষেত্র। আবার দেখে আসি আমার লীলাসঙ্গীকে!

'ঠিক তোমার মতই আমার একটি মেয়ে ছিল, মা।' জগন্নাথের মন্দিরে চুপচাপ বসে আছে মৃড়ানী, এক বৃদ্ধ বাঙালী ব্রাহ্মণ তাকে বললে।

তার অশ্রুসজল চোখের দিকে চেয়ে মৃড়ানী বললে, 'যে চলে গেছে তার জন্যে শোক কিসের?'

বৃদ্ধ বললে, 'সে গেছে যাক। তুমি আছ।'

'আমি?' মৃড়ানী হাসল। বললে, 'আমিও তো খাঁচাছাড়া। কখন কোন দিকে পালাই তার ঠিক নেই।'

'যে দিকেই যাও একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দেখে এস।'

'কাকে দেখব?'

'মা গো, সে এক অদ্ভুত মানুষ। কী সুন্দর দেখতে আর কী সুন্দর কথা!'

'সন্ন্যাসী?'

'সন্ন্যাসী না গৃহী জানিনা কিন্তু মা, প্রেমে মাতোয়ারা, গর্গর মাতোয়ারা।'

'অমন ঢের ঢের দেখেছি।' মৃড়ানী মুখ ফেরাল: 'সাধু-সন্নেসীতে আর আমার রুচি নেই।'

কলকাতায় ফিরে এলে বলরামবাবুও বারে বারে অনুরোধ করতে লাগল: 'চলো যাই দক্ষিণেশ্বরে। তোমাকে হলফ করে বলছি এমনটি আর দেখনি। হয়নি কখনো। দুঃখ হয় দিদি, শেষে না আপশোষ কর।'

'এ তোমার কেমনতর সাধু?' মৃড়ানী ঝামটা মেরে উঠল: 'তোমার সাধুর যদি ক্ষমতা থাকে আমাকে টেনে নিক তার কাছে। আমি নিজের থেকে যাব কেন?'
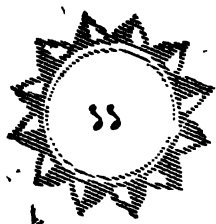
'আমি না টানলে তুই আসবি নি?'

'তুমি না টানলে তোমার কাছে যাই, যেতে পাবি, আমার এমন স্পর্ধা কী! কিন্তু কে তুমি? অন্ধকারে তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। তোমার মুখের উপর আলো ধরো। দেখতে দাও আমাকে।'

বারে বারে কে যেন মৃড়ানীকে টানছে। মনে হচ্ছে বুকে যেন কে স্থতো বেঁধে টানছে। বারে বারে সে স্থতোটা ধরতে চাইছে, পারছে না ধরতে। ছটফট করছে মৃড়ানী। দেয়ালে মাথা খুঁড়ছে। কাঁদছে। বলছে, বলো, কে তুমি? কোথায় তুমি?

সকাল হতেই অভিনবদর্শন।

অভিষেকের পর দামোদরের গা মুছে সিংহাসনে রাখতে যাচ্ছে মৃড়ানী, দেখলে, সিংহাসন খালি নেই, সেখানে দুখানি পা রেখে কে দাঁড়িয়ে আছে। কে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে শুধু দুখানি জীবন্ত পা।

চোখের ভুল নয় তো ? তা হলে এই আকাশভরা দিনের আলোও তো চোখের ভুল !

সর্ব শরীরে কাঁপতে লাগল মৃড়ানী। আর কোনো অবয়ব নেই শুধু দুখানি সজীব পা সিংহাসনের উপর তকতক করছে।

হাতের থেকে দামোদর পড়ে গেল মেঝের উপর।

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল মৃড়ানী। এমন দুর্ঘটন তো ঘটেনি কোনো দিন কী হবে !

দামোদরকে তুলে নিয়ে বারে বারে মাথায় ঠেকাতে লাগল। আবার অভিষেক করল। বসাল সিংহাসনে। মন্ত্র পড়ে তুলসী দিল দামোদরকে। কোথায় দামোদর ? তার বদলে সেই দুখানি কাঁচা তাজা পা। তুলসী গিয়ে পড়ল সেই পায়ের উপর। আবার দিতে গেল তুলসী। আবার সেই জলজ্যান্ত পা। আরো একবার। আরো একবার সেই প্রাণময় প্রাণপ্রদ পা দুখানি।

মৃড়ানী মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

এ কী, মৃড়ানীর ঘরের দরজা বন্ধ, ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই কেন ? বেলা বাড়তে চলল তবুও নিঃসাড়। বলরামের বাড়ির মেয়েরা ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠল। দেখ তো দরজার ফাঁক দিয়ে কিছু দেখা যায় কিনা।

দরজার ফাঁক দিয়ে যা দেখা গেল তা রোমহর্ষক।

মৃড়ানী ছিন্নলতার মত পড়ে আছে মেঝেতে।

বলরামের স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী ছুটে এলেন। ডাকতে লাগলেন মৃড়ানীকে। ওঠো, দোর খুলে দাও। কী হল তোমার ?

বলরামবাবুকে ডাকালেন। শিগগির ডাক্তার আনো।

দরজা খোলালেন বলরাম। দেখেই বুঝলেন এ ব্যাধি নয় এ মাধি।

তিন-চার ঘণ্টার পর মৃড়ানীর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু কথা

বলতে পারছেনা। শূন্য চোখে তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক। তাকাতে লাগল নিজের বুকের দিকে। যেন কী ধরতে চাইছে হাওয়ার উপর। উড়ন্ত সুতো। যেন কে সুতো দিয়ে তার বুকের ভিতরটা ধরে টানছে।

অব্যক্ত বেদনায় পুড়ে যাচ্ছে মৃড়ানী। কে টানছ? কে ফেলছ ছিন্ন ভিন্ন করে?

রাত্রেও ঘুম নেই। সেই টান। সেই কর্ষণ-আকর্ষণ।

'আমাকে চিনতে পাচ্ছিস না?' কণ্ঠে আনন্দ মাখানো, পরিচিত সুরে কে বলছে।

'গলা- আওয়াজে চিনি-চিনি মনে হচ্ছে। স্পষ্ট করে দেখা দাও না।'

'কাছে এলে তো দেখবি স্পষ্ট করে।'

'যাব? যাব তোমার কাছে?

'আসবি বই কি। আয়, আয়, শিগগির চলে আয় ছুটে।'

ধড়মড় করে উঠে বসল মৃড়ানী। ছুটে চলল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে। কিন্তু কোথায় যাবে? কে সে আনন্দী পুরুষ? কী তার ঠিকানা?

রাত্রি প্রায় ভোর-ভোর। ব্যাকুল হাতে সদর দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল মৃড়ানী।

আয় আয়। যেন বাঁশি বাজছে নিরন্তর। কারু সাধ্য নেই সে বংশীস্বরে নিশ্চল থাকে।

মহারাস রজনীতে কৃষ্ণের বাঁশি শুনে ব্রজাঙ্গনারা এসেছিল আকৃষ্ট হয়ে। কৃষ্ণ তাদের নানা ধর্মোপদেশ দিয়ে গৃহে ফিরে যেতে বললেন। তখন ব্রজাঙ্গনারা বললে, গৃহে ফিরে যেতে বলা সোজা কিন্তু বাঁশি বাজানো তো বন্ধ করছ না। আমাদের গুরুজনেরা শুনুক, শুনুক পতিব্রতারা, তারপর বলুক গৃহধর্মের আর্যপথে আর

ফিরে যাওয়া চলে কিনা। যে একবার শুনবে সেই আর পারবে না আমাদের নিন্দা করতে। সতী পতিব্রতারাও পাতিব্রত্য থেকে বিচলিত হয়ে তোমাকে চিত্ত অর্পণ করে ফেলবে। শুধু মানুষ কেন, পশু পাখি বৃক্ষ লতা চেতন অচেতন সবাই পুলকিত, রোমাঞ্চিত তোমার বেণুধ্বনিতে। কারু শক্তি নেই তোমাতে না সমাসক্ত হয়।

দারোয়ানের হাতে সদরের চাবি। দারোয়ান তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিগগেস করলে 'কোথায় যাচ্ছেন পিসিমা ? গঙ্গাস্নানে ?'

হাঁ-না কিছু বলতে পাচ্ছেনা মৃড়ানী। গঙ্গা কতদূর তাও যেন জানা নেই।

'এত ভোর রাত্রে যাবার কী দরকার ?' বললে দারোয়ান।

'যেখানে খুশি যাব।' ক্রুদ্ধ হল মৃড়ানী। 'শিগগির খুলে দাও বলছি।'

'কিন্তু কোথায় যাবেন তা বলুন।'

'তা জানি না।'

'দাঁড়ান, বাবুকে খবর দিই। আপনি অসুস্থ, অন্ধকারে একা একা যাওয়া কি আপনার ঠিক হবে ?'

বলরাম এসে বললে, 'দক্ষিণেশ্বরে যাবে দিদি ?'

বিভোর চোখে মৃড়ানী হেসে উঠল। হয়তো তাই, হয়তো সেইখানে।

এ সুযোগ আর ছাড়া নয়। তখুনি গাড়ি ডাকাল বলরাম। প্রতিবেশী চুনীলাল বসুর স্ত্রী আর কৃষ্ণভাবিনী সঙ্গে গেল। মৃড়ানীর বুকে তখনো টানাহেঁচড়ার ব্যথা। মুখে-চোখে যন্ত্রণার মালিন্য। কিন্তু দুই চোখে, কেন কে জানে, দিব্যানন্দের বিদ্যুতি।

'তোমার শীত করছে ?' কৃষ্ণভাবিনী একটা চাদরে মৃড়ানীকে আপদমস্তক ঢেকে দিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে এসে ঢুকল সকলে।

রামকৃষ্ণ তখন কী করছেন? তাঁর তক্তপোশে বসে একটা কাঠিতে করে কতগুলো সুতো জড়াচ্ছেন। আর গান গাইছেন :

'যশোদা নাচাত গো মা বলে নীলমণি,
সে রূপ লুকালি কোথা, করালবদনি শ্যামা,
একবার নাচ মা শ্যামা।'

অতিথিরা ঘরে ঢুকতেই সুতো জড়ানো বন্ধ করলেন রামকৃষ্ণ। কাঠিটা ফেলে দিলেন একপাশে।

নিমেষে মৃড়ানীর বুকের বেদনা দূর হয়ে গেল। বুঝল তার টানের উৎস কোথায়? কোন সুতো দিয়ে কে তাকে টানছে, টেনে আনছে, কতদূর পর্যন্ত টেনে এনে ছেড়ে দিচ্ছে। বুকের মধ্যেকার সুতোর পাকানো জট খুলে গেল সহসা। আরাম পেল মৃড়ানী।

সকলের দেখাদেখি মৃড়ানীও প্রণাম করল সেই সূত্রধরকে।

এ কী আশ্চর্যের আশ্চর্য। এ যে সেই দুখানি জীবন্ত পা! যা সে দেখেছে দামোদরের সিংহাসনে। যার উপব দিয়েছে সে তুলসী।

মুখের দিকে তাকাল মৃড়ানী। সিদ্ধ পুরুষ মৃদু মৃদু হাসছেন। কী অদ্ভুত, একে আগে কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না। পঁচিশ বছর মোটে বয়স, এখুনি লুপ্ত হল স্মৃতিশক্তি? কোথায় দেখেছি? হিমালয়ে, বৃন্দাবনে, নীলাচলে, কালীঘাটে?

'এ মেয়েটি কে?' বলরামকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আমার বোন।'

'তোমার সহোদর বোন?'

একটু বুঝি ইতস্তত করল বলরাম : 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বলতে চাও এ কায়েত ? মনে হয় না।'

ধরা পড়ল বলরাম। বললে 'না, ইনি ব্রাহ্মণকন্যা। আমার এক বন্ধুর ছোট বোন, আমার বাবাকে বাবা ডাকেন।'

'তাই বলো।' তারপর স্নেহ সুন্দর চোখে তাকালেন মৃড়ানীর দিকে। বললেন, 'এ যে এখানকার থাকের লোক। অনেক দিনের চেনা।'

'লজ্জা ঘৃণা ভয় হারা ঘরবাড়ি ছাড়া।
কৃষ্ণহেতু বিদেশিনী অনুরাগে ভরা॥'

এ যে সেই ব্রজগোপী। গুপ্-ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। যারা কৃষ্ণবশীকরণযোগ্য প্রেম বা মহাভাব রক্ষা করে তারাই গোপী। তারা মহাভাববতী কৃষ্ণপ্রেয়সী। কৃষ্ণসুখ ছাড়া তাদের অন্য কোনো কামনা নেই সংসারে। তাদের যে জীবন তা কৃষ্ণসুখের সাধন ছাড়া কিছু নয়। কৃষ্ণসেবার বাসন মনে করেই তারা দেহের মার্জন ভূষণ করে, কৃষ্ণকে নিয়েই তাদের দাসী-অভিমান। তাদের রতিই গাঢ়তমা।

সবাই উঠল, মৃড়ানীকেও উঠতে হল।

কী অসহন অবস্থা, ঐ পদাশ্রয় ঐ পদচ্ছায়া থেকে ক্ষণ-কালের জন্যেও তাকে সরে থাকতে হবে। চলে যেতে হবে বন্দীশালায়।

আর সকলের দেখাদেখি মৃড়ানীও বুঝি আঁচলে মুখ ঢেকে ছিল। এবার উঠে দাঁড়াতে ঠাকুর বললেন, 'তোমার মুখ ঢেকে থাকবার কী হয়েছে! তাকাও আমার দিকে।'

চোখে চোখ ফেললেন ঠাকুর। আর মুহূর্তে চিনে ফেলল মৃড়ানী।

এই সেই সাধু যিনি তাকে বাল্যকালে আশীর্বাদ করেছিলেন, তোমার কৃষ্ণে মতি হোক। এই সেই সাধু যিনি তাকে নিমতে-

ঘোলায় দীক্ষা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন আবার দেখা হবে গঙ্গাতীরে। শোকমোহহরা ভবভয়দ্রাবিনী গঙ্গা।

আর সেই যে ডাক আয়-আয়, এ তো এই মঙ্গলাকরেরই মঙ্গলকর কণ্ঠস্বর।

অশ্রুতে উথলে উঠল মৃড়ানী।

পরমসুহৃদের মত ঠাকুর আশ্বাস দিলেন: 'আজ এঁদের সঙ্গে যাও। আবার একদিন এস।'

কী অযাচিত অহেতুক কৃপা!

ঈশ্বরকৃপা জাতি কুল বিদ্যা ধন-কিছুরই অপেক্ষা রাখে না, হয়তো একটু প্রীতির অপেক্ষা রাখে। বিদুরের প্রীতির বশেই তার ঘরের খুদ খেলেন শ্রীকৃষ্ণ। সে খুদে যে আনন্দ তা দুর্যোধনের রাজভোগে ছিল না। কলার বদলে কৃষ্ণকে খোসা দিয়ে ফেলেছিল বিদুরের স্ত্রী, তাতে প্রীতি ছিল বলেই সে-খোসা খেতে কৃষ্ণের দ্বিধা হয়নি। মমত্ববুদ্ধিতেই কৃপা, মর্যাদাবুদ্ধিতে নয়। ঈশ্বর যেমন ভক্তের অধীন তেমনি তাঁর কৃপাও প্রীতির অধীন।

'মুঞি তোমা ছাড়িনু, তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপারজ্জু গলে বান্ধি চরণে আনিলা॥'

বলরাম বললে, 'দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণকে?'

'দেখলাম। আমার পিতা মাতা গুরু বন্ধু, আমার সমস্ত।' বললে মৃড়ানী, 'সর্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান।'

ইনিই সেই সর্বাকর্ষক, সর্বাহ্লাদক, ইনিই সেই মহারসায়ন।

১২

কত আর অপেক্ষা করা যায়!

পরদিন প্রত্যূষেই বেরিয়ে পড়ল মৃড়ানী। বুকে দামোদর আর হাতে তুখানি পরিধেয় বস্ত্র।

দারোয়ান সঙ্গে সঙ্গে এসেছে।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে মৃড়ানী বললে, 'তুমি এবার বাড়ি ফিরে যাও। দাদাবাবুকে গিয়ে বলো আমার যেতে দেরি হবে। যেন আমার জন্মে না ভাবেন।'

'তুমি কোথায় যাবে?'

'সে দাদাবাবুকে বলতে হবে না। সকল তীর্থের তীর্থ, ঠিকানা তো তিনিই চিনিয়ে দিয়েছেন।'

স্নান করে সোজা হেঁটে মৃড়ানী চলে এল দক্ষিণেশ্বর।

সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন রামকৃষ্ণ। 'এসেছিস?' উদার আনন্দে মৃড়ানীকে অভ্যর্থনা করলেন: 'তোর কথাই ভাবছিলুম। তুই আসবি বলে দাঁড়িয়ে আছি উৎসুক হয়ে। আয় ঘরে আয়।'

ঠাকুরের পদচ্ছায়ায় বসে নিভৃতিতে মৃড়ানী তখন তাঁকে সব বললে। উলটিয়ে গেল তার অতীতের পৃষ্ঠা।

'কিন্তু তুমি যে সশরীরে এখানে লুকিয়ে আছ, তা এতদিন কই বুঝতে দাওনি তো।' কেঁদে উঠল মৃড়ানী।

প্রসন্ন হাস্যে ঠাকুর বললেন, 'তা হলে এত সাধন ভজন কী করে হত!'

মা-ঠাকরুন বলতেন, 'পাথরেব একটা নুড়ি নিয়ে গৌরদাসী কী ভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে।'

পাথরের নুড়ি! সেই তো মৃড়ানীর 'সেথো ঠাকুর'। সারাক্ষণ রয়েছেন বুকের মধ্যে।

কিন্তু সেবার উড়িষ্যায় নরেন্দ্র সরোবরে স্নান করতে নামবার আগে বিগ্রহশিলাকে ঘাটের এককোণে পুঁটলির মধ্যে রেখেছিল লুকিয়ে। নাইতে গিয়ে যদি পড়ে যায় শিলা তা হলে নিজেই সেই অতল জলে ডুববে। তাই এই সতর্ক ব্যবস্থা।

কিন্তু স্নান করে উঠে দেখে পুঁটলি নেই।

'আমার ঠাকুর?' পাগলের মত হয়ে গেল মৃডানী। এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করতে লাগল। বলতে লাগল : 'এই তো এইখানে ছিল। স্নান করতে কতই আর দেরি করেছি, তার মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল! সরোবরের লোভে আমি আমার মনোবরকে হাবালাম।'

কোথাও কিছু নেই, পুঁটলির তন্তুটিও কোথাও নেই।

'ঠাকুর, আমার ঠাকুর!' স্থলে-জলে কোথাও এ[illegible]কু প্রতিধ্বনি নেই। আদ্যোপান্ত নির্মম নিষ্ঠুরতা।

মৃড়ানী ঠিক করল জলে ডুবে আত্মহত্যা করবে।

'মায়ী, ক্যা হুয়া?' কোত্থেকে এক সাধু এসে ডাকল মৃড়ানীকে।

'আমার সর্বনাশ হয়েছে।'

'কোনো জিনিস হারিয়েছ? কী হারিয়েছ?'

'আমার সর্বস্বধন হারিয়েছি।' ক[illegible]ায় ভেঙে পড়ল মৃড়ানী।

'সর্বস্বধন কি এমনি কেউ পথে-ঘাটে ফেলে রেখে যায়?' বলে সাধু পুঁটলিটি বার করে দিল।

'আমার ঠাকুর!' মৃড়ানী তখন পাগল হয়েছিল দুঃখে, এখন হল আনন্দে।

'আমি পেয়েছিলুম বলে রক্ষে। যদি কোনো ছেলে-ছোকরা নিয়ে যেত চুরি করে?' সস্নেহ তিরস্কার করল সাধু।

তোমাকে বুকে নিয়ে কত দুর্গম গিরি কান্তার মরু পার হয়েছি, আজ তুমি আমাকে জলে ডুবিয়ে রেখে পালিয়ে যাচ্ছিলে একা-একা? দামোদরকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরল মৃড়ানী। আমার স্বামী, আমার সর্বস্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'সাধন ভজন ঢের হয়েছে, এবার তপস্যাপূত জীবনটা মায়েদের সেবায় লাগাও। ওদের ভারি কষ্ট।'

মৃড়ানীকে নিয়ে এলেন সারদামণির কাছে, নহবতখানার নিচের ঘরে। বাইরে থেকে হাঁকলেন: 'ওগো ব্রহ্মময়ী, দেখ কে এসেছে।'

দরমার বেড়ার আড়ালে একটু বুঝি বা চঞ্চল হলেন সারদামণি।

'একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, না? এই নাও সঙ্গিনী। মৃড়ানীকে ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন ভিতরে।

ছোট একমুঠো একটু ঘর, সিঁড়ির নিচেটুকুতে রান্না। কালীঘরের ভোগ সহ্য হত না বলে ঠাকুরের রান্নাও এইখানে। এইখানে শোওয়া, বসা, খাওয়া—সমস্ত। বেঁটে-মতন দরজা, ঢুকতে প্রায়ই মাথা ঠুকে যায়। শোওয়ার জায়গায় মাথার উপরে মাছের হাঁড়ি। তাতে ঠাকুরের জন্যে জিয়োনো শিঙ্গি কলকল করে। তা ছাড়া জিনিসপত্রও এই ঘরে।

এই ঘরেই থাকতে এল মৃড়ানী। মায়ের মেয়ে। কখনো সঙ্গিনী। কখনো সখী। কখনো পরিচারিকা। কখনো পরিহাসিকা।

শেষরাতে বকুলতলার ঘাটে স্নান করতে যান মা। সঙ্গে মৃড়ানী।

সেদিনও গিয়েছেন। জল পর্যন্ত নেমেছেন মা, মৃড়ানী কয়েক ধাপ উপরে দাঁড়িয়ে। কী একটা কালো-মতন পড়ে আছে জলে। অলক্ষিতে তার উপর মায়ের পা পড়ল।

'ওরে বাপ রে!' মা ত্রস্ত পায়ে উপরে উঠে এলেন।

মৃড়ানীও তাঁকে জড়িয়ে ধরল। কি, কী হল?

'কুমির গো!' মা হাঁপাতে লাগলেন।

হাসতে লাগল মৃড়ানী। 'ও কুমির নয় গো, কুমির নয়। ও ছদ্মবেশী শিব, তোমার চরণপরশের জন্যে পড়ে আছে।'

'তোমার রঙ্গ রাখো।' সরল বালিকার মত মা তখনো ভয়ত্রাসে। বললেন, 'আমি কিনা ভয়ে মরি। একেবারে কুমিরের উপর গিয়ে পড়েছিলুম।'

'তোমার আবার ভয় কিসের?' হাসতে লাগল মৃড়ানী।

যখন মা-ঠাকরুন দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন না তখন মৃড়ানী চলে যেত বাগবাজারে, বলরাম বসুর বাড়িতে। গেলে কী হবে, মন পড়ে থাকত দক্ষিণেশ্বরে।

বলরামের বাড়িতে খেতে বসেছে মৃড়ানী, হঠাৎ মনে হল ঠাকুরকে দেখে আসি। মনে হওয়া মাত্রই খাওয়ার মধ্যিখানে উঠে পড়ল। কোনোদিকে তাকাল না, সোজা ছুট দিল উত্তরে—দক্ষিণেশ্বরে।

পৌঁছেই ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রাণ ঢেলে প্রণাম করল মৃড়ানী।

তখন, প্রণাম করবার পর মৃড়ানীর খেয়াল হল, এঁটো হাতেই সে চলে এসেছে। তখন ছুটল গঙ্গার দিকে। ঠাকুর হাসতে লাগলেন।

'গৌরী মহা তপস্বিনী।' বললেন ঠাকুর।

একদিন তার হাতে সন্ন্যাসের বস্ত্র দিলেন। হোমে বেল পাতা উৎসর্গ করলেন নিজের হাতে। মৃড়ানীর সন্ন্যাস-নাম দিলেন 'গৌরী-আনন্দ'।

'আমি গৌরের দাসীর দাসী আর তাতেই আমার আনন্দ।'

ঠাকুর ডাকলেন গৌরী বলে, কখনো বা গৌরদাসী। মায়ের কাছে গৌরদাসী, কখনো বা গৌরমণি। ভক্তের কাছে গৌর মা, গৌরী মা। কখনো বা যোগিনী মা।

'তোর এটি সিদ্ধ শালগ্রাম।' গৌরদাসীর দামোদরকে বুকে-মাথায় করে আদর করেন ঠাকুর। বলেন, 'আমায় যিনি সাধন ভজন শিখিয়েছিলেন সেই ব্রাহ্মণীরও তোরই মত শালগ্রাম শিলা ছিল।'

গৌরদাসীর কেমন সুন্দর ভাবসমাধি হয়। মা-ঠাকরুন দেখেন তাই তন্ময় হয়ে। তাঁর এমনটি হয় না ?

ঠাকুরের ভাইঝি লক্ষ্মীকে পাঠালেন ঠাকুরের কাছে। বল গে তোর খুড়োকে আমাকে অমনি সমাধিস্থ করে দিক। আমি তো আর কিছু তপস্যা-টপস্যা করিনি যে আপনা-আপনি হবে। ঠাকুর যদি কৃপা করে দেন সেই গভীরের স্পর্শ।

লক্ষ্মী তাই বলতে গেল ঠাকুরকে।

ঠাকুর 'না' করে দিলেন। বললেন, 'গৌরী কালীঘাটের মেয়ে, সে ওসব সহ্য করতে পারবে। তোর খুড়ির পক্ষে গোপন থাকাই ভালো। অবলার অবলায় বৃদ্ধি অবলার অবলায় সিদ্ধি।'

গৌরী সরলা, সাহসিকা, সন্ন্যাসব্রতধারিণী। ঠাকুরের একদিকে সন্ন্যাসী পুত্র বিবেকানন্দ, আরেক দিকে সন্ন্যাসিনী কন্যা গৌরী।

খাপখোলা তলোয়ার আর ত্বরিতস্ফুরিত তড়িল্লেখা। পাতাল খোঁড়া শিব আর কৃষ্ণাভিসারিণী রাধিকা।

ঠাকুরের জন্যে রান্না করছে গৌরদাসী।

রবিবার, অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছে। সকলেরই আকাঙ্ক্ষা ঠাকুরের খাওয়া দেখবে।

ঠাকুর বসেছেন আসনে, ভক্তদের কেউ-কেউ তাঁকে হাওয়া করছে। আর সবাই চিত্রার্পিত হয়ে শুনছে তাঁর অমৃতকথা। আর চোখে অনিমেষ আগ্রহ, কী না জানি তিনি খাবেন আর কেমন ভাবে।

ঠাকুরের সামনে ভাতের থালা রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল গৌরী।

'আমার গৌরদাসীর মত ভক্তি কজনের?' খেতে-খেতে সাহ্লাদ চোখে বলছেন ঠাকুর, 'আর কী জ্বলন্ত বৈরাগ্য!'

ঠিক-ঠিক সন্ন্যাসী বা ত্যাগীর লক্ষণ কেমন জানো? যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে সেই সাধু। সাধু সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা কয়না। সাপের ন্যাজ মাড়ালে আর রক্ষে নেই—ন্যাজেই যেন তার বেশি লাগে। তেমনি ঈশ্বরের কথাতেই সাধুর বেশি হুঁশ।

যারা ঠিক ঠিক ত্যাগী তারাই গেরুয়া পরবে। যাদের বার-ভিতর এক হয়ে গেছে, আসক্তির লেশ মাত্র নেই, তারাই গেরুয়ার যোগ্য পাত্র। যার মনে আসক্তি রয়েছে, মাঝে মাঝে পতনও হচ্ছে

অথচ বাইরে গেরুয়া, সে বড় ভয়ঙ্কর। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভালো।

সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়, যেহেতু তার হৃদয়মধ্যেই বিষ্ণু-পদ। সূর্যের কিরণ সব জায়গায় সমান পড়লেও জলের ভিতর আর্শিতে ও সকল স্বচ্ছ জিনিসের ভিতর বেশি প্রকাশ পায়। ভগবানের বিকাশ সকল হৃদয়ে সমান হলেও সাধুর হৃদয়ে বেশি। সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে তবে তো লোকের সাহস হবে। এই ত্যাগ যদি সন্ন্যাসী না শেখায় তবে আর কে শেখাবে?

গৌরদাসী আমার সেই শুদ্ধ শুক্ল নিরঞ্জন জ্যোতি।

শুনতে-শুনতে গৌরীমার গভীর ভাবাবেশ হল। ঠাকুরও মহাভাবে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চারদিকে ভাবের মহা প্লাবন শুরু হল। ভক্তদেরও লাগল সেই সম্বেগ। 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে দিতে লাগল করতালি।

সেই থালাভরা প্রসাদ সকলকে বিলোতে লাগলেন ঠাকুর। 'কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয়।' শুধু রসনা দিয়ে আস্বাদনই প্রসাদের মুখ্য আস্বাদন নয়, অন্তরে আস্বাদনই মুখ্য আস্বাদন। প্রসাদে যে সৌরভ যে মাধুর্য তা লৌকিক বস্তুতে কোথায়? লৌকিক বস্তুতে যেই ভক্তি মিশল অমনি তা প্রসাদ হয়ে গেল। আর, প্রসাদ কে খায়? ভক্তের জিহ্বাগ্রে ভগবানই তা ভোজন করেন।

গৌরহরি কীর্তন করতে করতে কত মূর্ছিত হতেন ভূতলে। কিন্তু এই ঠাকুর তো তেমন আছাড় খান না! গৌরীমার প্রায়ই ইচ্ছে হত তেমনটি কী আর দেখা যায়?

কেন যাবেনা? তোমার যখন তেমনটি দেখতে সাধ হয়েছে নিশ্চয়ই তা পূর্ণ হবে। ভগবান তো ভক্তপরাধীন।

ধ্রুব কৃষ্ণকে জিগগেস করল, 'তোমার কানের কুণ্ডল দোলেনা কেন?'

কৃষ্ণ হেসে বললে, 'তুমি দোলালেই দোলে।'

ভগবান তো ভক্তপরাধীন। ভক্তের কাছে তিনি আত্মবিক্রয় করে দিয়েছেন। ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিই ভূয়সী। ভক্তিই গরীয়সী। সর্ব-সাধন-গরীয়সী। 'পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।'

সেদিন রাম দত্ত ও আরো অনেকে বসে আছে, গৌরীমাও বসে আছেন, ঠাকুর বলছেন ভগবৎপ্রসঙ্গ।

'দেখ, আমি ভাবতুম ভগবান যেন সমুদ্রের জলের মত সব জায়গা পূর্ণ করে রয়েছেন, আর আমি যেন একটি মাছ– সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবছি, ভাসছি, সাঁতার দিচ্ছি। আবার কখনো মনে হত আমি যেন একটি কুম্ভ। সেই জলে ডুবে রয়েছি, আর আমার ভিতরে-বাইরে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ হয়ে রয়েছেন। আরো এক রকম আছে। ভাবতুম অনন্ত আকাশ, তাতে পাখি হয়ে পাখা বিস্তার করে আনন্দে উড়ছি। চিদাকাশ, আত্মাপাখি। খাঁচা ছেড়ে মহানন্দে উড়ছি চিদাকাশে।'

বলতে-বলতে ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন। টলতে লাগলেন। আর কেউ এগিয়ে এসে ধরবার আগেই পড়ে গেলেন মাটিতে।

'এমন কেন হল? এমন তো কোনদিন হয় না।' ব্যস্ত হয়ে উঠল রাম দত্ত।

অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগলেন গৌরীমা। আমারই জন্যে ঠাকুর আহত হলেন।

এই লীলারঙ্গের রহস্য কী, বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে রাম দত্ত জিগগেস করলেন ঠাকুরকে: 'কেন আপনি পড়ে গেলেন?'

'কেন, গৌরদাসীকে জিগগেস করো।' গৌরীর দিকে চেয়ে অপাঙ্গে হাসলেন ঠাকুর।

'বলুন, কেন ঠাকুর পড়লেন মাটিতে?' গৌরীমাকে ধরল সকলে।

'আর কেন! মনে বাসনা হয়েছিল ঠাকুরকে মাটিতে পড়তে

দেখি।' গৌরীমার ছুচোখে জল দাঁড়াল : 'ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু তা টের পেলেন। পূর্ণ করলেন অভিলাষ।' কী করে ক্ষতিপূরণ করবেন তারই চেষ্টায় সেবায় প্রাণ ঢেলে দিলেন।

রামনবমীর দিন ঠাকুর দিব্যি মিষ্টি খাচ্ছেন, উপোস করেন নি। কঠোর তপস্যার মানুষ, গৌরীমা আছেন উপবাসে।

মিষ্টির আদ্ধেকটা খেয়ে বাকিটা ঠাকুর গৌরীকে দিলেন, বললেন, খা।

দ্বিরুক্তি না করে গৌরীমা তা খেয়ে ফেললেন।

'এই রে। আজ রামনবমীর উপোস না ?' ঠাকুর প্রায় হায়-হায় করে উঠলেন : 'কী হবে ?'

গৌরীমা হাসলেন। বললেন, 'তোমার প্রসাদের চেয়ে আর বড় কী। তোমার বিধানের কাছে কিসের বিধিনিষেধ !'

নিয়মনিষ্ঠায় নির্বিচল গৌরী। অর্জুনকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, হে পার্থ, চিত্তকে অন্য বিষয়ে যেতে না দিয়ে শুধু অভ্যাসবলে তাকে স্থির করে দিব্য পরম পুরুষের ধ্যান করো, তা হলে সেই পরম পুরুষকেই প্রাপ্ত হবে। আর যদি অভ্যাসে অসমর্থ হও, মৎকর্ম-পরায়ণ হও। আমার প্রীতির জন্যে যদি কর্ম করো তাহলেও তুমি সিদ্ধিলাভ করবে। যদি তাও না পারো আমাতে কর্মার্পণ করো, ত্যাগ করো সমস্ত ফলাশা।

'এত কঠোর তপস্যা আর কে করেছে ?' বলছেন মা-ঠাকরুন, 'এত তেজ এত কৃচ্ছ্র সহ্য করতে পারে এমন কার ধাত আছে ?'

ঠাকুর তার কঠোরতা কমিয়ে আনছেন। শুধু ভক্তিতে দ্রবীভূত করছেন, রঞ্জিত করছেন অনুরাগে।

অনুরাগ শাস্ত্রযুক্তি মানে না। অমলা অকৈতবা ভক্তি। সে ভক্তির নিয়ম-নীতি নেই। শাস্ত্রভয় নেই। শুধু কৃষ্ণসেবার লোভ। শুধু প্রীতি কৃষ্ণবিষয়িনী।

সেই বৃন্দাবনে মনে আছে এক ব্রজবালক গৌরীমাকে বলেছিল, 'আরে মায়ী, ক্যা তু দিনভর সাধন ভজন করতা হ্যায়? সবেরে উঠকে একদফা বোল দেনা রাধেশ্যাম, ব্যস, হো গিয়া।'

গৌরীমা বললেন, 'তাতো ঠিক কথাই। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে যদি ডাকার মত ডাকা যায় তবে তো এক ডাকেই কেল্লা ফতে। কিন্তু মনে সে ডাক আনবার জন্যেই তো এত মার্জন-তর্জন। সাধন-ভজন। অভ্যাসে-তপস্যাতেই মনকে তৈরি করে নিতে হবে যাতে আনতে পারে সে ডাক। বীণাকে দৃঢ় করে বাঁধতে হবে তবেই তো ফুটবে সেই অনুরাগের ঝঙ্কার।'

কিন্তু তুমি রাত দিন এ কার কাছে পড়ে আছ? এক ভক্ত জিগগেস করল গৌরীমাকে।

'কার কাছে আবার? যিনি একাধারে রাম আর কৃষ্ণ সেই রামকৃষ্ণের কাছে।'

'আমি তো জানতাম তিনি শুধু তোমার দীক্ষাগুরু।'

'তিনি জগদগুরু। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ অভেদ।'

'কী যে বলো!' ভক্ত পরিহাস করে উঠল: 'ভগবানের নামের সঙ্গে মানুষের নাম করলে?'

'করলামই তো। কিন্তু এই মানুষটিই তো ভগবান।'

'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।'

'যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতি।'

'ঈশ্বর সর্বস্থানে সর্বভূতে আছেন বটে কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পোরে না, প্রয়োজন মেটে না। তাই তিনি মানুষ-দেহ ধারণ করে ধরায় অবতীর্ণ হন।' বলছেন ঠাকুর, 'কী রকম জানো? যেমন নল দিয়ে বড় ছাদের জল হুড়হুড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরই শক্তি নলের ভিতর দিয়ে আসছে। নরলীলায় অবতারকে চিনতে পারা কঠিন। কেননা তাকে ঠিক মানুষের মত

ব্যবহার করতে হয়। সেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-শোক কখনো বা ভয়—ঠিক মানুষের মত।' নিজের শরীরের দিকে ইঙ্গিত করলেন: 'এবার গুপ্তভাবে আসা। যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য পরিদর্শন।'

'আমাকে তোর কী মনে হয়?' ঠাকুর একদিন জিগগেস করলেন গৌরীমাকে।

'তুমি আবার কে?' গৌরীমা বললেন অকপটে, 'তুমি সেই।'

বালকের মত আনন্দ করে উঠলেন ঠাকুর। উপস্থিত-অনুপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ওগো, দেখ গো, গৌরী কী বলছে! বলছে আমি নাকি সেই—'
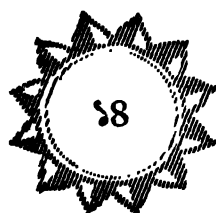
কিন্তু উনি কেমনতরো? মা-ঠাকরুনের দিকে ইঙ্গিত করে কেউ-কেউ। পরমহংস যাঁর স্বামী তাঁর কি গয়না পরা ভালো দেখায়?

এক ভক্ত-মেয়ের মুখ থেকে অমনিধারা মন্তব্য মায়ের কানে এল। সাধব্যের চিহ্ন, শুধু দু-গাছি বালা রাখলেন হাতে আর সমস্ত গয়না খুলে ফেললেন মা।

গৌরীমা সেদিন ছিলেন না দক্ষিণেশ্বরে। কলকাতায় দাদার বাড়ি গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন, এ কী, মা যে বৈরাগিনী সেজেছেন।

যোগেন-মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন মার এই যোগিনীবেশ?'

'অলঙ্কারে ভক্ত-মেয়েরা আপত্তি করছে।'

'আপত্তি করছে? কোন যুক্তিতে?'

'বলছে সন্ন্যাসীর বউ সন্ন্যাসিনী হবে। তার কেন সাজসজ্জা?'

'কে বলেছে? তার বুদ্ধিকে বলিহারি।' দৃপ্ত স্বরে বললেন গৌরীমা, 'ওরা জানে না মা আমার বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী। ওরা জানে না মায়ের গায়ে সোনা থাকলেই জগতের কল্যাণ।'

তখন, দুই মেয়ে বা দুই সখী, মাকে সাজাতে বসলেন। যত রাজ্যের আভরণ পেলেন, পরালেন। দুর্গা প্রতিমার মত ঝলমল করতে লাগলেন মা। কেমন অপরূপ দেখতে হয়েছে বলো তো। চলো এবার কত্তাকে দেখিয়ে আনি।

এই জবড়জং বেশে মা কিছুতেই যাবেন না। গৌরীমাও ছাড়বেন না কিছুতে। ঠেলেঠুলে প্রায় একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে গেলেন ঠাকুরের কাছে।

পরনে চওড়া কস্তাপেড়ে লাল শাড়ি, সিঁথেয় সিঁদুর, কালো ভরাট মাথার চুল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে, গলায় সোনার কণ্ঠিহার, নাকে নথ, কানে মাকড়ি, হাতে চুড়ি আর বালা—দেখতে সে কী রাজরাজেশ্বরী মূর্তি!

'ওরে ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী, তাই সাজতে ভালোবাসে।' বলছেন ঠাকুর, 'ও জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে? ও আমার শক্তি।'

'গৌরমণি ভৈরবীর মত।' বলছেন মা-ঠাকরুন, 'কাউকে দ্বিধা নেই, ভয় নেই এক ফোঁটা। বলত, তোমার অত ভয় কিসের? তোমাকে দেখতে পাওয়া লোকের ভাগ্যে থাকা চাই। বলে আমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে ধরে নিয়ে যেত ঠাকুরের ঘরে। ভক্তদের সরিয়ে দিত ঘর থেকে। আমার লজ্জার শেষ থাকত না। কিন্তু আমার গৌরমণির যে কথা সেই কাজ। কাজটি হাসিল করে তবে ছাড়ত। এমনি মেয়ে সে।'

'তোমারই তো মেয়ে।'

সে একবার গাঁয়ের মেয়েদের উপদেশ দিচ্ছেন ঠাকুর, শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে সারদা। অন্য মেয়েরা তাকে ঠেলে তুলে দেবার চেষ্টা করছে। কেউ আপশোষ করে বলছে, 'আহা, এমন কথাগুলি শুনলে না, ঘুমিয়ে পড়ল।'

ঠাকুর বাধা দিয়ে বললেন, 'না গো না, ওকে তুলো না। ও কি সাধে ঘুমুচ্ছে? এ সব কথা শুনলে ও এখানে থাকবে না, চোঁচা দৌড় মারবে।'

পাগলী মামী সারারাত মাকে গাল দিচ্ছে: 'ঠাকুরঝি মরুক, ঠাকুরঝি মরুক।'

ভোরবেলা মা বলছেন, 'ছোট বউ জানে না যে আমি মৃত্যুঞ্জয়।' আত্মীয়দের দৌরাত্ম্যে তিক্ত বিরক্ত হয়ে বলছেন, 'ত্যাখ তোরা আমাকে বেশি জ্বালাতন করিস নে। এর ভেতর যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন তো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কারু সাধ্য নেই তোদের রক্ষা করে।'

ঠাকুর একদিন জিগগেস করলেন গৌরীমাকে: 'হ্যাঁরে গৌরী, তুই কাকে বেশি ভালোবাসিস?'

সরাসরি উত্তর না দিয়ে গৌরী গান ধরল:

'রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী,
লোকের বিপদ হলে
ডাকে মধুসূদন বলে
তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশিতে বলো রাইকিশোরী॥'

মা-ঠাকরুন কাছেই ছিলেন, কুণ্ঠায় গৌরীমার হাত চেপে ধরলেন। ঠাকুর চলে গেলেন হাসতে-হাসতে।

'ঠাকুর আর আপনি তো এক।' এক ভক্ত মাকে বললে দৃঢ়স্বরে।

মা বললেন, 'ছি, ও কথা বলতে আছে, বোকা ছেলে! আমি যে তাঁর দাসী। সব ঠাকুর, ঠাকুর ছাড়া কিছু নেই।'

আরেক দিন আরেক ভক্ত জিগগেস করল মাকে, 'মা, ঠাকুর কি আপনাকে দেখা দেন? আপনার হাতে খান?'

মা বললেন, 'আমরা কী আলাদা?' বলেই জিভ কাটলেন: 'কী বলে ফেললুম!'

যা, দেখে আয় তো কী করছেন, মাঝে মাঝে গৌরীকে মা-ঠাকরুন পাঠাতেন ঠাকুরের ঘরে, ঠাকুরের খোঁজে। গৌরী মায়ের শুধু সঙ্গিনী নয়, মায়ের দূতী, অনুচরী।

কই, ঠাকুর ঘরে নেই তো। গৌরীমা গঙ্গার দিকে ছুটলেন ব্যাকুল হয়ে। ভাবের ঘোরে কোথায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন তার ঠিক কী।

ওমা, গঙ্গার ধারে গোলাপ বাগানের মধ্যে সমাধিস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন: পরনের কাপড় কাঁটায় জড়িয়ে রয়েছে। অতি যত্নে গৌরীমা কাঁটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঠাকুরের হাত ধরে আস্তে আস্তে ঘরে নিয়ে এলেন।

সেদিন তো গঙ্গার ঘাটের শেষ সিঁড়িতে বসে গঙ্গার দৃশ্য দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে জলের মধ্যেই নেমে পড়েছিলেন। দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে এলেন গৌরীমা। গৌরীমার সজাগ চোখে মায়েরই উন্মনতা, মায়েরই পশ্যন্তী দৃষ্টি।

'মায়া আয়, মায়া আয়।' ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে-নেড়ে কাকে ডাকছেন ঠাকুর।

দেখতে পেলেন গৌরীমা। কাছে এসে বললেন, 'ব্যাপার-খানা কী?'

'একজনকে ডাকছি।'

'বুঝতে পাচ্ছি না বুঝি কাকে ডাকছেন?'

'তোদের জন্যেই ডাকছি।' বরদ হাস্যে বললেন ঠাকুর, 'মনটা আজকাল প্রায় সব সময়েই ওপরের দিকে উঠে থাকে, চেষ্টা

করেও নামাতে পারি না সহজে। তাই মায়াকে ডাকছি, যাতে মায়ায় জড়িয়ে ছেলেদের নিয়ে তোদের নিয়ে আরো কিছু দিন খেলা করি।'

'এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি তা জানতে পারে॥
বিল করে, ঘুনি পাতে, মীন প্রবেশ করে তাতে।
যাওয়া-আসার পথ খোলা, তবু মীন পালাতে নারে॥
গুটিপোকায় গুটি করে কাটলে সে তো কাটতে পারে।
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি আপনার নালে আপনি মরে॥'

এক স্ত্রী-ভক্ত একটি আগন্তুক ছেলেকে মানুষ করতে চাইছে। মার কাছে এসেছে পরামর্শ নিতে। মা বললেন, 'অমন কাজও কোরো না। যার উপর যেমন কর্তব্য তাই শুধু করে যাবে। কিন্তু ভালো এক ভগবান ছাড়া কাউকে বেসো না। ভালোবাসলে অনেক দুঃখ।' বিষাদে কণ্ঠস্বর আচ্ছন্ন হয়ে এল: 'দেখ না আমি রাধুকে নিয়ে মায়ায় কত ভুগছি। কাকেই বা মানুষ করেছিলুম, মা, একটুও বুদ্ধি নেই। ঐ বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কতক্ষণে স্বামী ফিরবে। মনে ভয়, ঐ গান বাজনা যেখানে হচ্ছে, পাছে ঐখানেই মন্মথ ঢুকে পড়ে। কী আসক্তি মা, কী আসক্তি! ওর যে এত আসক্তি হবে তা কে জানত।'

তাজপুরের মাখনলাল চাটুজ্জের ছেলে মন্মথনাথের সঙ্গে রাধারানীর সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে। জয়রামবাটিতে গৌরীমা এলে মা-ঠাকরুন তাকে বললেন, 'বিয়ের আগে তুমি নিজে একবার রাধির শ্বশুরবাড়ি ঘুরে এসো মা।'

গৌরীমা গেলেন দেখে আসতে। পথে মন্মথর সঙ্গে দেখা। কিশোর মন্মথ গাছে উঠে আম পাড়ছে। কোঁচড়ে করে আম নিয়ে ফিরছে বাড়ির দিকে।

তার সঙ্গে আলাপ করলেন গৌরীমা। তাকে ধরে তার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে।

ফিরে এসে গৌরীমা মাকে সব বিবরণ দিলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিল বোধহয় রাধারানী। তাকে দেখেই গৌরীমা পরিহাসে উছলে উঠলেন : 'রাধাকান্ত, আম পেড়ে আন তো।'

শুনেই রাধু লজ্জায় জড়িপটি হয়ে দে-ছুট।

রাধু যখন বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি যায়, মা বলেছিলেন, 'রাধি, গয়নাগাটি পেয়ে যেন ঠাকুরকে ভুলিস নি। ঠাকুরই সব, আর সব মিছে।'

আরামবাগের ডাক্তার প্রভাকর মুখুজ্জে মাকে বললেন, 'মা, সংসারে বড় যন্ত্রণা। কি করব। কিসে শান্তি হবে?'

মা সজল চোখে বললেন, 'ঠিক কথা বাবা, সংসারে কোনো শান্তি নেই। ঠাকুর আছেন, রক্ষা করছেন তোমাদের। কিন্তু বাবা, সংসার করা বা আত্মীয়স্বজন নিয়ে থাকা মহাপাপ। রাধিটার বিয়ে দিয়ে মহা অন্যায় করেছি। এখন ভুগছি হাড়ে-হাড়ে।'

রাধু ক্রমাগত অসুখে ভুগছে। ভুগে-ভুগে মেজাজও তিরিক্ষির একশেষ। মা বলছেন, 'এই রাধির উপর আমার আর মন নেই। রোগ ঘেঁটে-ঘেঁটে বিতৃষ্ণা হয়েছে। জোর করে মন টেনে রাখি। বলি, ঠাকুর, রাধির উপর একটু মন দাও, নইলে কে ওকে দেখবে?'

বিষ্ণুপুর থেকে গরুর গাড়িতে জয়রামবাটি যাচ্ছেন। সঙ্গে রাধু। গাড়ি কোতলপুরের কাছাকাছি এলে রাধু মাকে পা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বললে, 'তুই সর, তুই যা, নেমে যা গাড়ি থেকে।'

মা যথাসম্ভব সরতে-সরতে বললেন, 'আমি যদি যাব তবে তোকে নিয়ে তপস্যা করবে কে?'

অথচ সেবার কলকাতা যাবার আগে রাধুকে দেখবার জন্যে মা তাকে আনিয়েছেন শ্বশুরবাড়ি থেকে। যেই রাধু নেমেছে পালকি

থেকে অমনি মা দু হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকছেন, আয় মা রাধু, আয়। রাধু আসতেই জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে।

মায়ের বেড়াল হলে কী হয়, এতটুকু তার ধর্মজ্ঞান নেই। চুরি করে খেয়ে ভুস্টিনাশ করছে। তার দৌরাত্ম্যে সবাই অস্থির। মা বেড়ালের হয়ে বলছেন, 'ও থাকে এ বাড়িতে, এ বাড়িরটা না খেলে ও পাবে কোথায়? আর চুরি করে খাওয়া, সে তো ওর স্বধর্ম।'

তবু সেদিন অতিষ্ঠ হয়ে মা-ই লাঠি ওঁচালেন, আজ তোর পিঠ ভাঙব। বেড়ালটা ভয় পেয়ে পালাল না, মায়ের পায়ের কাছেই আশ্রয়ের আশায় লুটিয়ে পড়ল।

মায়ের মায়া হল। বললেন, 'এমন করে আশ্রয় নিয়েছে, এখন আর ওকে মারি কী করে বলো।'
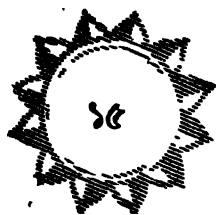
গৌরীমার মা গিরিবালা এসেছেন ঠাকুর দেখতে। গৌরীমার ছোটবোন ব্রজবালাও এসেছে।

গিরিবালা কালীসাধিকা। যেমন গান বাঁধতে পারেন তেমনি গাইতেও পারেন। কল্পনা ও কলকণ্ঠ দুইই তাঁর করায়ত্ত।

ঠাকুর বললেন, 'তোমার মাতৃসঙ্গীত শোনাও, মা।'

ঘরভরা লোক, তাদের মধ্যে বসে গিরিবালা গান কী করে? তিনি তো আর তাঁর মেয়ের মতন সমস্ত বাধা ও বিধি পেরিয়ে আসা সন্ন্যাসিনী নন।

'আচ্ছা, আমি সব লোক সরিয়ে দিচ্ছি ঘর থেকে।' ঠাকুর আশ্বাস দিলেন।

ঘর ফাঁকা হয়ে গেল।

'তোমার সেই গানটি গাও মা—হর-হৃদি-পদ্মে মায়ের পাদপদ্ম—'

গিরিবালা গান ধরলেন :

হর-হৃদি-পদ্মে মায়ের পাদ-পদ্মে কি এতই শোভা
কত যোগী ঋষি চিন্তে যাঁরে, চিন্তামণির মনোলোভা।

ঠাকুরের প্রতি গিরিবালার ভক্তির অন্ত নেই কেননা ঠাকুর সাক্ষান্মোক্ষকরী মা-কালীর বরপুত্র। কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী? তাঁর আবার বৈশিষ্ট্য কী? তিনি শুধু পরমহংস মশায়ের পরিবার। একজন সাধু তপস্বীর স্ত্রী মাত্র।

'কী যে বলো তুমি মা,' গৌরীমা সবিস্ময়ে প্রতিবাদ করে ওঠেন : 'তুমি প্রত্যক্ষ মাহেশ্বরীকে চিনতে পারলে না? সারা জীবন কালীভজন করেও তোমার এই মতি?'

'আমার মতি আমাতে থাক।' বললেন গিরিবালা। 'তোদের ভেতরে এখনো ঢের অভাব আছে তাই বাইরে দৃষ্টি ফেলতে হয়। ত্রিপুরেশ্বরী আমার হৃদয়ে বিরাজ করছেন, তাই আমার আর কারু প্রয়োজন নেই।'

'অদৃষ্টে থাকলে তো হবে।'

'আমার দুরদৃষ্টই ভালো।' চোখ বুজে অন্তরে দেখতে চাইলেন ত্রিপুরাকে। কই, এ কী, দেখা যাচ্ছে না তো তারিণীকে। দুই চোখে দারুণ পিপাসা হঠাৎ কেঁদে উঠল : 'দয়াবিভবকারিণীং বিশদলোচনীং তারিণীং, ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে।'

'একবার চোখের দেখা দেখে আসতে দোষ কী।' গৌরীমা আবার মিনতি করলেন।

'তুই দ্যাখ গে যত খুশি।' আবার অন্তরে চোখ রাখলেন গিরিবালা। 'দেবীং ভজে হৃদি পরমামৃতসিক্তগাত্রীম।'

না, যে শূন্য সেই শূন্য।

তখন গিরিবালা বললেন, 'চল দেখে আসি তোর মাকে।'

নহবতে মা গৃহকর্মে ব্যস্ত, গৌরীমার সঙ্গে এসে দাঁড়ালেন গিরিবালা।

পরিচয়ের দরকার হল না, মা সস্মিতস্নেহে ডাকলেন গিরিবালাকে: 'এসো মা এসো।'

মায়ের মুখের দিকে চেয়েই গিরিবালা নিস্পন্দ হয়ে গেল। চিৎকার করে উঠল: 'এ কি, মা, তুমি? সেই তুমি?' পায়ে লুটিয়ে পড়ল, পদধূলি মাখতে লাগল চোখে মুখে ললাটে।

এ যে সেই মুক্তকেশী মহামায়া। শিবা সাধ্যা সুরেশ্বরী। কৃপাপারাবারা পরমেষ্ঠী।

'এ কী, তোমার মা এত উতলা হলেন কেন?' হাসিমুখে জিগগেস করলেন মা।

'কে জানে কেন?'

'সত্যি কী হল বলো তো?' স্ত্রী-ভক্ত আরো যারা ছিল, তারাও ব্যগ্র হল কৌতূহলে।

'যা হবার তাই হয়েছে।' বললেন গৌরীমা, 'অন্তরের ছায়াকে দেখেছেন বাইরের বাস্তবে! সমস্ত ভ্রমভঞ্জন হয়েছে।'

প্রথম দর্শনে গিরিশ ঘোষের কণ্ঠেও সেই বিস্ময়: 'এ কি, মা, তুমি?'

কলেরা হয়েছে গিরিশের, জীবনের আশা নেই। কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছে। এখন বোধহয় আর ঘণ্টার প্রশ্ন নয়, মিনিটের প্রশ্ন।

স্বপ্ন দেখল গিরিশ। দেখল পরনে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি, দেহে অমর্ত জ্যোতি, দুই চোখে বিস্তৃত করুণা, এক মাতৃমূর্তি দাঁড়িয়েছেন শিয়রে। হাতে প্রসাদ। স্নেহপূর্ণ স্বরে বললেন, খাও। শুধু বললেন না, স্বহস্তে খাইয়ে দিলেন। তেমন সুস্বাদু দ্রব্য

কোনোদিন খায়নি গিরিশ। দেখেওনি এমন শোকহারিণী দক্ষিণা মূর্তি।

প্রসাদ খেয়ে গিরিশ ভালো হয়ে গেল।

প্রথম মায়ের মুখখানি দেখল জয়রামবাটিতে, তিনবছরের শিশু-পুত্রটি মারা যাবার পর। মায়ের দর্শনে পুত্রশোকের যন্ত্রণা লাঘব হবে এই আশায় এসেছিল মায়ের সান্নিধ্যে। মাকে আমি দেখব চোখের উপর, মা আমার দিকে তাকাবেন চোখ মেলে, এই কল্পনায় শিহরিত হতে হতে স্নান করে এল গিরিশ। মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

আগেই তাকাল না মায়ের মুখের দিকে। আগে মায়ের চরণ দুখানিতে মাথা রাখল। প্রণাম সেরে যেই মাথা তুলে মাকে দেখল, আর্তনাদ করে উঠল, 'এ কি, মা, তুমি ?'

এ যে সেই প্রসাদদাত্রী সর্বাভীষ্টপ্রদা মাতৃমূর্তি। অকালমৃত্যু-নাশিনী দয়ার্দ্রহৃদয়া।

'তোমার ভাগ্যই বেশি ভালো।' বলরাম বোস বলছেন তাঁর স্ত্রীকে : 'তোমরা দুদিকের ভাগই পাচ্ছ।'

'দুদিকের ভাগ মানে ?'

'ঠাকুরের দিকের ভাগ, আবার মায়ের দিকের ভাগ। আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হলেও তো মায়ের দিকে যাবার উপায় নেই।'

'তবে আরেক জন্মে প্রকৃতি হয়ে জন্ম নিয়ো।'

'সে তো পরের জন্মে। সেই যে বৈষ্ণবের প্রার্থনা, 'কবে বা প্রকৃতি হব' !

বলরামবাবু বললেন, 'যেদিনই মাঠাকরুনের কাছে যাবে তাঁর চরণছোঁয়া হাতখানি রাখবে আমার মাথায়, আমার বুকে।'

সেই বলরামের মেয়ে ভুবনমোহিনী। খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে, জামাইটিও শাঁসালো। সৌভাগ্যে সম্পদে ঝলমল করছে ভুবন।

জামাই স্বয়ং এসেছে ভুবনকে তার পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে যেতে।

ভুবনও যাবে বলে পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ কেন কে জানে দক্ষিণেশ্বরের কথা মনে পড়ে গেল। তখন বলরামকে গিয়ে বললে, 'বাবা, দক্ষিণেশ্বর যাব।'

'তা এখন কী?' একটু বা বিরক্ত হলেন বলরাম।

'না, এখুনি যাব। ঠাকুর আর মাঠাকরুনের পায়ের ধুলো নিয়ে আসব।' ভুবন দৃঢ়স্বরে বললে: 'ওঁদের পায়ের ধুলো না নিয়ে আমি যাত্রা করব না।'

মেয়েটার কি মাথাখারাপ? বর গাড়ি নিয়ে বসে আছে, আর তুই, মেয়ে, সাজগোজ করে সেই গাড়িতে গিয়ে উঠবি, তা নয়, বলছিস কিনা দক্ষিণেশ্বর যাবি। দিনক্ষণ নিরূপণ নেই, ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে? বললেই হল? জামাই কী বলবে?

কৃষ্ণভাবিনীও নিরস্ত করতে চাইলেন। বললেন, 'তুই যদি এখন এ অবস্থায় চলে যাস জামাই অসন্তুষ্ট হবে।'

'হলে হবে।'

'ছেলেমানসি করিসনে। জামাই যদি রাগ করে চলে যায়, সামলানো কঠিন হবে।' কৃষ্ণভাবিনী প্রবোধ দিতে চাইলেন: 'এখন শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিস তাই যা, পরে না হয় একবার দক্ষিণেশ্বর ঘুরে যাস।'

'না, আমি এখুনি যাব। আমার মন যখন একবার ডাক দিয়েছে আমি বসে থাকব না।'

গৌরীমা হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত।

'এই যে তুমি এসেছ।' কৃষ্ণভাবিনী গৌরীমাকে ধরলেন: 'তুমি বলে দাও এইটে কি দক্ষিণেশ্বরে যাবার সময়?'

সব শুনে গৌরীমা ভুবনের পক্ষে গেলেন। বললেন, 'ভগবানের কাছে যাবার কি কালাকাল আছে? শুভ ইচ্ছা মনে জাগলেই যাত্রা

শুভ। শুভ ইচ্ছাকে ফেলে রাখতে নেই। লগ্নের অপচয় ঘটানো মূর্খতা। বাঁশি ডাকতেই ব্রজাঙ্গনারা গৃহকাজ ফেলে ছুট দিল। আমি সেদিন এঁটো হাতেই বেরিয়ে পড়লাম।'

গৌরীমাকে দলে পেয়ে ভুবনের আনন্দ আর ধরে না।

'কর্ণ তৃষ্ণায় মরে পড় রসায়ন শুনি।' কৃষ্ণের ভূষণ যা মুরলীর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিনা, কর্ণ-রসায়ন কৃষ্ণকথা শোনাও, নয়তো দেখাও সেই মদনমোহনকে।

বলরামও শিথিল হলেন : 'এতই যখন ওব উৎকণ্ঠা, তখন যাক, একবার দণ্ডবৎ করে আসুক।'

গাড়ি এসে খিড়কির দুয়ারে দাঁড়াল। কৃষ্ণভাবিনী ও গৌরীমার সঙ্গে চলল ভুবন।

গৌরীমা বললেন, 'কোনো ভয় নেই। যাঁদের কাছে যাচ্ছি তাঁরাই রক্ষা করবেন।'

দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে ঠাকুরকে প্রণাম কবল সকলে। কৃষ্ণভাবিনী বললে, কেন এই অসময়ে আসা। বললে, 'আশীর্বাদ করুন যেন মেয়েটার বিপদ না হয়।'

ঠাকুর বললেন, 'বিপত্তারিণীর আশীর্বাদ নিয়ে যাও, সমস্ত শুভ হবে।

মায়ের কাছে এল সকলে। বললে ভুবনের জেদের কথা। ঠাকুর-ঠাকুরাণীর পায়ের ধুলো না নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবে না।

'এখন দেরি দেখে কী হয় কে জানে।' চিন্তিত স্বরে বললে কৃষ্ণভাবিনী।

'কেন, কী হবে!' সরল বালিকাব মত মুখ করলেন মা।

'জামাই বড়লোকের ছেলে, মেজাজী, রাগ করে না চলে যায় একা-একা।'

'গেলে যাবে। কিসের এত ভয় শুনি?' ভুবন ঝামটা দিয়ে

উঠল : 'যদি এই অপরাধে ত্যাগ করে তো করবে। বয়ে গেল।'

'বয়ে গেল ?' কৃষ্ণভাবিনী ধমকে উঠল।

'হ্যাঁ, আমি তখন মা-ঠাকরুনের কাছে এসে থাকব,' তন্ময়ের মত বললে ভুবন, 'ঝি-গিরি করব। খাবার ভাবনা কী, মায়ের হাতের প্রসাদ তো মিলবে—'

'কী কথার ছিরি !' কৃষ্ণভাবিনী ভুরু কুঁচকোলেন।

'বলরামদাদার মেয়ের মতই কথা।' গৌরীমা গর্বের সুর আনলেন : 'মধুরতম কথা।'

ভুবনের মুখখানি হাতে করে তুলে ধরে সস্নেহে একটু দেখলেন মা-ঠাকরুন। মমতায় ভরা অন্তরঙ্গ চোখে তাকিয়ে বললেন, 'না-না, ভক্ত-মেয়েকে তার স্বামী ত্যাগ করবে কী। না মা, আমি আশীর্বাদ করছি স্বামী-পুত্র নিয়ে তুমি সৌভাগ্যে থাকবে। তোমার সংসার কৃষ্ণনিকেতন হবে।'

যেখানে ভক্তি সেখানে কৃষ্ণ। যে রসে ভক্ত সুখী সে রসে কৃষ্ণও বশংবদ। সেই তো উন্নত-উজ্জ্বল রস। সেই রাস-রস-প্রবর্তক সর্বার্থ-পরিপূর্ণ গোপীনাথ তোমার কুশল করবেন।

সবাই বাড়ি ফিরে এসে দেখল জামাই শান্ত হয়ে শ্বশুরেব সঙ্গে গল্প করছে। বলরাম জামাইকে রাখতে পেরেছে আবদ্ধ করে। আর যখন রাতই হয়ে গেল, তখন জামাই বললে, রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাব।
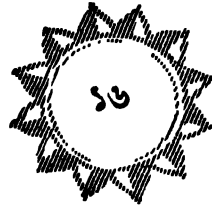
কেদার চাটুয্যে ঠাকুরের ভক্ত। হালিসহরে থাকেন, কলকাতার আপিসে কাজ করেন। আপিসে যাবার পথে দক্ষিণেশ্বর হয়ে যান। অতি প্রেমিক লোক, অন্তরে গোপীর ভাব, ঈশ্বরের কথা হলেই চোখের জলে ভাসতে থাকেন।

কোত্থেকে এক বৈরাগী এসেছে, গান ধরেছে :

এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।

এবারে বর্ষা ভারী হও হুঁশারী, লাগো আদা জল খেয়ে॥

যখন আসবে শ্রাবণা দেখতে দেবে না,

বাঁশবাঁখারি পচে যাবে, ঘর ছাওয়া হবে না।

যেমন আসবে ঝটকা, উড়বে মটকা, মটকা যাবে ফাঁক হয়ে॥

আপিসের পোশাক পরা কেদার এসে উপস্থিত। কেদারকে দেখেই ঠাকুরের বৃন্দাবন-লীলার উদ্দীপন হল। প্রেমে বিহ্বল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন আর কেদারকে সম্বোধন করে গান ধরলেন : 'সখি সে বন কতদূর? যেথা আমার শ্যামসুন্দর- আর যে চলিতে নারি—'

সেই কেদার এক ইংরেজ সাহেব নিয়ে এসেছে দক্ষিণেশ্বর।

মিস্টার উইলিয়াম তো ঠাকুরকে দেখে ভীষণ খুশি। তুমি আবার কোন মতের?'

কেদার আগে ব্রাহ্মসমাজে ভিড়েছিল, তারপরে কর্তাভজা,

নবরসিক, অনেক কিছু করেছে। এখন সব ছেড়ে ধরেছে ঠাকুরকে। ঠাকুরকে ধরা মানেই চোখের জলে প্রক্ষালিত হওয়া।

রাম জিগগেস করলে, 'কেদারবাবু, কর্তাভজাদের ওখানে বুঝি গিয়েছিলেন ?'

'হ্যা, ও পাঁচফুলের মধু আহরণ করে।' ঠাকুর বললেন, 'সেখানকার মেয়েগুলো জিগগেস করলে, আমাদের মুক্তি কি হবে না ? বললাম, হবে যদি একজনেতে ভগবান বলে নিষ্ঠা রাখো। পাঁচটা পুরুষের সঙ্গে থাকলে হবে না।'

'তুমি কী চাও ?' উইলিয়মকে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'কিছু না। শুধু ঈশ্বরে ভক্তি।'

'তাঁর প্রেমের এক বিন্দু যদি কেউ পায় সংসারকানন অতি তুচ্ছ বলে বোধ হয়।' বললেন ঠাকুর, 'মিছরির পানা পেলে চিটে গুড়ের পানা তুচ্ছ হয়ে যায়। যদি ঈশ্বরভক্তি দেখতে চাও,' তাকালেন কেদারের দিকে, 'বলরামের বাড়িতে গৌরীকে দেখে এস।'

কেদার উইলিয়মকে গৌরীমার কাছে নিয়ে এলেন।

পবিত্রতার নির্ধূম বহ্নিশিখা—গৌরীমাকে দেখে উইলিয়ম অভিভূত হয়ে গেল। নতজানু হয়ে বলতে লাগল, 'মাদার মেরী, মাদার মেরী—' বলতে বলতে প্রণাম করল ভূমিষ্ঠ হয়ে।

সাহেবকে গৌরীমা প্রসাদ এনে দিলেন।

প্রসাদকেই বারে বারে প্রণাম করতে লাগল উইলিয়ম। খেতে লাগল তৃপ্তিতে। আর কিছু নয়, আর কিছু নয়, শুধু ঈশ্বরভক্তি।

ঈশ্বরের নাম করো, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। অভ্যাস থেকেই পৌছুবে অনুরাগে। আর যদি ভালোবাসা একবার আসে তা হলেই হয়ে গেল। সাঁতরে-সাঁতরে সিন্ধু, তার পর স্রোতে-স্রোতে সেই অতলতল।

গৌরীমার আশ্রমে এসেছেন অশ্বিনী দত্ত। জীবের প্রতি

ভগবানের কী অহেতুক কৃপা সেই কথাই বলছিলেন দুজনে। জগাই-মাধাই দুই দস্যুকে দুই মহাভাগবতে পরিণত করে দিলেন গৌরাঙ্গ।

'নানা অবতারে নানা পাপী উদ্ধার করেছ,' বললে জগাই-মাধাই, 'কিন্তু আমাদের দুই পাতকীর উদ্ধারই অদ্ভুততম। আমাদের উদ্ধারে অজামিল-উদ্ধারের মহত্ত্বও অল্প হয়ে গেল। অজামিলের মুখে নারায়ণ নাম শুনে চারজন বিষ্ণুদূত এসেছিল আর আমরা রক্তপাত করা সত্ত্বেও তুমি নিজে এসে উপস্থিত হলে। তোমার মহিমা, তোমার সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র, পরিষদ সব তুমি গোপন করে রাখলে। এরই নাম নিলক্ষ্য উদ্ধার।'

'আর আমার যীশুখৃষ্ট ?' গাঢ় আবেগে বলে উঠলেন গৌরীমা : 'জীবের কল্যাণে প্রেম বিতরণ করতে গিয়ে কত কষ্টই না পেলেন! আহা, শেষকালে কিনা হতভাগ্যের দল তাঁকে পেরেকে বিঁধে মেরে ফেললে গা ? উঃ, সে কী ভীষণ!'

গৌরীমা যেন সর্বাঙ্গে সেই তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করলেন। আর্তনাদ করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর নিশ্চল পাথর হয়ে গেলেন।

সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

'শিবের দুই অবস্থা।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ : 'যখন আত্মারাম তখন সোঽহং। যোগেতে সব স্থির। যখন 'আমি' বলে একটি আলাদা বোধ থাকে তখন রাম-রাম বলে নৃত্য। যাঁর অটল আছে তাঁর টলও আছে। এই তুমি স্থির, আবার তুমিই কিছুক্ষণ পরে কাজ করবে। জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিস। তবে একজন বলছে জল, আরেকজন বলছে, বরফ। জ্ঞানের পথে যে সমাধি তার নাম জড়সমাধি, আর ভক্তি-পথের যে সমাধি তার নাম ভাবসমাধি। ভাবসমাধিতে রেখার মত একটু অহং থাকে সম্ভোগের জন্যে, আস্বাদনের জন্যে।'

'কেদারকে বললুম, কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে হবেনা। ইচ্ছে হল একবার তার বুকে হাত বুলিয়ে দি, কিন্তু পারলাম না। ভিতরে অঙ্কট-বঙ্কট।'

কিন্তু সে বন কতদূর ? যেখানে আমার শ্যামসুন্দর।

গৌরীমা যাচ্ছেন খড়দায় শ্যামসুন্দরকে দেখতে। নৌকোয় একেবারে কলকাতা থেকে খড়দা। দাঁড়াও, দক্ষিণেশ্বরে নেমে ঠাকুরকে প্রণাম করে যাই।

সঙ্গিনীদের নৌকোয় রেখে তিনিই একাই নামলেন। বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা করো, দেখে আসি ঠাকুর আছেন কিনা।

কিন্তু ঠাকুরের ঘরে এসে যা দেখলেন তা অভাবনীয়। দেখলেন ঠাকুরের সামনে প্রহ্লাদের একখানি পট পড়ে আছে আর ঠাকুর সমাধিস্থ, দুই চোখে অনর্গল ধারা নেমেছে। গৌরীমার বুঝতে বাকি রইল না দৈত্যশিশু প্রহ্লাদের ছবি দেখেই ঠাকুরের উদ্দীপনা হয়েছে।

অসুরোত্তম প্রহ্লাদ নিরুপাধি ভক্ত। এই জন্য লোকপ্রলোভনে ভগবান তাকে প্রলুব্ধ করতে চাইলেও প্রহ্লাদ নিস্পৃহ রইল। বললে, যে তোমার দেখা পাবার পর তোমার থেকে সাংসারিক কল্যাণ প্রার্থনা করে সে তোমার সেবক নয়, সে বণিক। প্রভুর নিকট যে নিজের ঐশ্বর্যের আশা করে সে ভৃত্য নয়, আর যিনি নিজের প্রভুত্ব-ইচ্ছায় ভক্তকে সৌভাগ্য সম্পদ দেন তিনিও প্রভু নন। আমি তোমার নিষ্কাম ভক্ত, তুমিও আমার নিরভিসন্ধি প্রভু। হে বরদশ্রেষ্ঠ, তুমি যদি আমাকে অভিলষিত বর নিতান্তই দান করো তাহলে আমার হৃদয়মধ্যে যেন কোনো অভিলাষই অঙ্কুরিত না হয় এই বরই আমি যাচ্ঞা করি।

সমাধিমধ্যেই ঠাকুর অতি কষ্টে 'জল'-কথাটা উচ্চারণ করলেন।

গৌরীমা জল নিয়ে এলেন। তাঁর হাতের জল খেয়ে প্রকৃতিস্থ হলেন ঠাকুর। বললেন, 'ঘাটে যে মেয়েদের রেখে এলে তাদের কী হবে ?'

'ও, সত্যিই তো'—আশ্চর্য, তাদের কথা আর মনে ছিল না গৌরীমার।

'জানো আমি আজ শ্যামকে কোলে করেছিলুম।' বললেন ঠাকুর, 'শ্যামের আজ পোশাকের বদল হয়েছে। আজ তার পরনে কল্কাপেড়ে কাপড়, মাথায় মুকুট! যাও তাকে নয়ন ভরে দেখে এস।'

খড়দাতে শ্যামসুন্দরকে দেখে সকলে অবাক। ঠাকুর যেমনটি বলেছিলেন, পরনে কল্কা পেড়ে কাপড়, মাথায় মুকুট।

'কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়।' সেই বাঁশি কি পাচ্ছ না শুনতে? সে বাঁশি কোথায় বাজছে? বন-মাঝে না মন-মাঝে? 'সর্বত্র কৃষ্ণের রূপ করে ঝলমল।' 'যাহা শুনি শ্রবণে সকলি কৃষ্ণনাম। সমস্ত ভুবন দেখি গোবিন্দের ধাম॥'

বিল্বমঙ্গল বৃন্দাবনে যাচ্ছে, বালকবেশে কৃষ্ণ চলেছে পথ দেখিয়ে। বিল্বমঙ্গলের ভীষণ ইচ্ছে বালকের হাতখানি একবারটি ধরে। ভাবতে-ভাবতেই ধরে ফেলল হাত। আর তক্ষুনি কৃষ্ণ হাত ছাড়িয়ে নিল জোর করে।

বিল্বমঙ্গল বললে, 'খুব গায়ের জোর দেখালে। হাত ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়ে গেলে। আমার হৃদয় থেকে যাও তো এমনি। যদি পারো তবেই তো বুঝি তোমার গায়ের জোর, তোমার পৌরুষ, তুমি কত বড় বাহাদুর।'

বিরহে জর্জর গৌরহরি। কখনো কৃষ্ণকে নির্দয় বলছেন, কঠোর বলছেন, কখনো অভিমানভরে বলছেন ও দগ্ধ নাম মুখে আনবনা। কৃষ্ণের নাম না নিয়ে গোপীদের নাম নিচ্ছেন। আবার কখনো

অনাবৃত সারল্যে দেখা দাও বলে আর্তনাদ করছেন। কখনো চপল বলছেন, কখনো বলছেন করুণাবরুণালয়।

যত্ন মল্লিকের বাড়ি গিয়েছিলেন ঠাকুর। ফিরে এসে ডাকলেন গৌরীমাকে। বললেন, 'যত্ন মল্লিকের বাড়ির মেয়েরা তোকে দেখতে চেয়েছে। একদিন যাস ওখানে।'

'তুমি বুঝি ওদের কাছে আমার প্রশংসা করছিলে?'

'প্রশংসা আবার কী!'

'তোমার ঐ এক কাণ্ড, যত পারো বাড়িয়ে বলো।'

'আহা, তোর কৃষ্ণে ভক্তি, কৃষ্ণে আবিষ্টতা, এটুকু কথা বলতে পারব না?'

'না, কেন বলবে?'

'একটা হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে সংসারটা ত্যাগ করে গেলি, ভগবানের জন্যে ছাড়লি সর্বস্ব, এটা কম কথা হল? চল, আমিই তোকে নিয়ে যাব।'

গৌরীমা কি ঠাকুরের অবাধ্য হতে পারে? তাঁর সঙ্গে গেলেন যত্ন মল্লিকের বাড়ি। সঙ্গে আরো অনেক স্ত্রী-ভক্ত।

গৌরীমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি ব্রজের মেয়ে, এঁর গোপীভাব।'

'গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে অবসান।' গোপীর সুখ কৃষ্ণের সুখ দেখে, নিজের সুখবাসনা থেকে নয়। 'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ। এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ-মুখ॥' কিন্তু নিজের আনন্দ যদি কৃষ্ণসেবার বিঘ্ন ঘটায় সে আনন্দকেও গোপী নিন্দনীয় মনে করে। আমার আনন্দ ততক্ষণই গ্রাহ্য যতক্ষণ তা কৃষ্ণসেবার অনুকূল।

কৃষ্ণের সারথি দারুক চামর দিয়ে বীজন করছে কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ সেই সেবা নিচ্ছেন এই আনন্দে দারুকের সাত্ত্বিক ভাব, স্তম্ভ হল,

হাতে জড়তা এল, চামরবীজন ব্যাহত হল। প্রেমানন্দ কৃষ্ণসেবার ব্যাঘাত ঘটাল বলে দারুক নিজের প্রেমানন্দকে ধিক্কার দিল। তেমনি দেখ রুক্মিণীকে। কৃষ্ণের দর্শনে রুক্মিণীর সাত্ত্বিক ভাব, অশ্রুর উদয় হয়েছে, কৃষ্ণের মুখখানি দেখতে দিচ্ছে না। কৃষ্ণের মুখ দেখে তার যে সুখ হবে তাই দেখেই তো কৃষ্ণের আবার প্রীতি বাড়বে, সুতরাং এই অশ্রু কৃষ্ণসেবার প্রতিবন্ধক। গোবিন্দদর্শনের আনন্দকেও তাই সে পারছে না অভিনন্দন করতে। গোপীর সেই প্রেম যা স্বাভাবিক যা নিত্যসিদ্ধ, যাতে কামগন্ধের, স্বসুখবাসনার লেশমাত্র নেই, যা আগুনে পোড়ানো সোনা। নির্মল উজ্জ্বল পবিত্র। তাই তো গোপী কৃষ্ণের প্রাণাধিক-প্রিয়তম।

সর্ববিধ-অপেক্ষা-রহিত যে গোপীপ্রেম সেই গোপীপ্রেমই গৌরীমার।

যদু মল্লিকের বাড়ি ঠাকুর গান ধরলেন। গাইতে গাইতে সমাধিস্থ। নামকীর্তন সুরু করল গৌরীমা।

'নামসঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়।' নামই প্রেমামৃতমণ্ডিত, নামই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন।

'খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥'

ঠাকুর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। গৌরীমাকে বললেন, 'এবার একবার তোকে মণি মল্লিকের বাগানে যেতে হবে।'

'এ কাদের নিয়ে এলি ?' গৌরীমাকে জিগগেস করলেন ঠাকুর

বলরাম বোস কাছে ছিলেন, তাঁকেও জিগগেস করলেন, 'এরা কারা ?'

এক পুরুষ আর এক নারী। স্বামী আর স্ত্রী।

কারু কিছু বলবার আগেই ঠাকুর বললেন, 'এরা যে বশিষ্ঠ-অরুন্ধতী।' বলতে বলতে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

দক্ষিণ কলকাতার বেলতলায় থাকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, মধুসূদন ভট্টাচার্য আর তার সহধর্মিণী। অনেকদিন থেকেই এঁদের ঠাকুরকে দেখবার আগ্রহ। দক্ষিণ কলকাতার মেয়ে গৌরীমার সঙ্গে এঁদের পরিচয়, তাই তাঁকে ধরেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতে, দেখাতে একবার লোকার্তিহরকে, গুরুগুণগরিষ্ঠকে।

কিন্তু এরা স্বামী-স্ত্রী যে বশিষ্ঠ আর অরুন্ধতী, ঠাকুর বলে না দিলে কেউ চিনত না। ঠাকুর আর মা-ঠাকরুন তাই তাদের বেলতলার কুটিরে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও দেখেছেন এদের, বললেন, 'বাপ রে, এরা এই হোগলার চালার মধ্যে কী কাণ্ডটাই না করছে !'

এমনি, কোনো আড়ম্বর নেই, বিজ্ঞাপন নেই, জ্যোতির্ময় ভক্ত সাধারণ সহজ জীবনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। কত ছাইয়ের মধ্যে হীরকখণ্ড।

তেমনি সেবার ঠাকুর পানিহাটি যাচ্ছেন নৌকোয়। আলাদা নৌকোয় গৌরীমা আর স্ত্রী-ভক্তের দল।

এড়েদার কাছে আসতেই ঠাকুর নৌকো ভেড়াতে বললেন।

এখানে কী? সকলে অবাক হল।

ঠাকুর বললেন, 'ঘাটে একজন আছেন।'

বলে ঠাকুর নামলেন ঘাটে। সেখানে এক মহিলা নিবিষ্টমনে শিব পূজো করছে। 'এই, এই এক খাঁটি ভক্ত।' বলে এগিয়ে গেলেন তার কাছে। গিয়ে, নিজের থেকেই তার মাথার উপরে আশীর্বাদের হাত রাখলেন। বললেন, 'তোমার কল্যাণ হোক।'

মহিলা তো চোখ মেলে অভিভূত! এ তুমি কে ভক্তানুরক্ত, ভক্তানুকম্পী দীননাথ

ভাববিহ্বল হয়ে গেলেন ঠাকুব। টলতে টলতে উঠলেন গিয়ে নৌকোয়। আমি সর্বজ্ঞ, সর্বগ, সর্বান্তরাত্মা। আমি জহুরী, হীরের দাম জানি, আমি বাজারের বেগুনওয়ালা নই।

মহিলা আবার তন্ময় হল তার শিবে, তার পরাৎপরমে।

দক্ষিণেশ্বরে এক বুড়ি এসেছে ঠাকুর দেখতে, তার হাতে একটি পাতার ঠোঙায় দুখানি সন্দেশ। সামান্য অবস্থার মানুষ, এর বেশি আর কী দিয়ে তোমার সেবা করতে পারি? তুমি তো দান দেখ না প্রাণ দেখ।

কিন্তু ঠাকুরের ঘরে ঢুকবে কী করে? সেখানে উচ্চণ্ড ভিড়।

নবতে এসে মা-ঠাকরুনকে বললে, 'তুমি বুঝি পরমহংস মশায়ের পরিবার? একটু সন্দেশ এনেছিলুম তাঁকে দেব বলে। তা সেখানে যা ভিড় ঢুকতে পেলুম না। তা তোমাকে দিয়ে যাই, তুমিই আমার হয়ে তাঁকে এটুকু খাইয়ে এসো মা। আমি ততক্ষণ না হয় তোমার এখানেই বসে থাকি।'

মা বললেন, 'বাইরের লোক থাকলে আমি তো যাই না ঐ ঘরে।

তোমার তো কোনো বাধা নেই, তুমিই গিয়ে নিজ হাতে দিয়ে এস ঠাকুরকে। ঠাকুর তো কারু একলার নন, তিনি সকলের।'

সাহস করে গেল তখন বুড়ি। দেখল তক্তপোশের নিচে ভক্তরা তাদের নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখেছে। বুড়ি তার ছোট ঠোঙাটি সেই স্তূপের মধ্যে একটি ফাঁক করে গুঁজে রাখল। আর দাঁড়াল না। ঠাকুরকে একটা দণ্ডবৎ জানিয়ে চলে গেল আপন মনে। সে যে দিতে পেরেছে তাতেই সে চরিতার্থ। সে দানে ধনী নয়, দিতে পারায় ধনী।

ভাবাবেশ প্রশমিত হলে ঠাকুর খেতে চাইলেন।

ইশারা বুঝতে পেরে তক্তপোশের নিচে থেকে সবচেয়ে বড় ঠোঙাটি বার করলেন গৌরীমা।

এ ঠোঙা ঠাকুরের পছন্দ হল না। বললেন, 'এটা নয়, আরেকটা।'

বড়টা রেখে গৌরীমা মাঝাবি সাইজেব একটা ঠোঙা আনলেন।

'না ওটাও নয়। আরেকটা। ছোট্টটা। দুখানি মোটে সন্দেশ।' ঠাকুর অস্থির হয়ে উঠলেন।

গৌরীমা বুড়ির ঠোঙাটা বার করলেন এবার।

কিছু না বলে ঠাকুর হাত বাড়িয়ে কেড়ে নিলেন ঠোঙাটা। খেলেন সন্দেশ দুটো।

একেই তো বলে ভক্তের ভগবান। ভগবান ভক্তাধীন, ভক্তপরবশ।

যারা জপধ্যান করছে তাদের ডেকে-ডেকে খেতে দিচ্ছেন ঠাকুর। বলছেন, 'ওরে, পেট ঠাণ্ডা করে ডাক। সন্তান পেট ঠাণ্ডা করে ডাকলে কি মা রাগ করেন? মা কি পর? আগে খেয়ে নে, তারপর আবার জপধ্যান করবি।'

গৌরীমাকে বললেন, 'যা তুই সকলকে খাবার দিয়ে আয়।'

সেদিন গৌরীমা অনুপস্থিত, রাখালের খিদে পেয়েছে। ঠাকুর

টের পেয়েছেন। আর অমনি ঠাকুর গঙ্গার ধারে গিয়ে ডাকতে সুরু করেছেন আর্তকণ্ঠে : 'ও গৌরদাসী, আয় না চলে, আমার রাখালের খিদে পেয়েছে।'

শূন্য নদীর দিকে তাকিয়ে রাখাল বলছে, 'নদীতে গৌরদাসী কোথায়?'

'খুব ডাকলেই সে এসে পড়বে।' ঠাকুর সরল বিশ্বাসে বললেন, 'তাকে পাঠিয়ে দেবেন ভগবান।'

'তাকে পাঠালেই বা কী!' রাখাল আপত্তি করে উঠল : 'খাবার আসবে কোত্থেকে? তোমার দক্ষিণেশ্বরে কিছু পাওয়া যায় না, দোকানও নেই কাছাকাছি। গৌরী এসে করবে কী? দোয়াত আছে কালি নেই। হাঁড়ি আছে চাল নেই।'

'না, না, গৌরদাসী এলে খাবারও আসবে।' ঠাকুর বললেন গাঢ়স্বরে, 'গৌরীর আমার খাদ্যের ভাণ্ডার।' বলে আবার আর্তনাদ সুরু করলেন : 'ও গৌরদাসী, আমার রাখালের বড় খিদে পেয়েছে। শিগগির আয় খাবার নিয়ে।'

রাখাল তারস্বরে প্রতিবাদ করছে : 'ছি ছি খিদের কথা এমনি করে রাষ্ট্র করে নাকি কেউ?' লোকে ভাববে কি! বলবে কি!'

কী ভাববে! কী বলবে! সরল সহজ খিদে পেয়েছে সত্য কথাটা বলব না চেঁচিয়ে? তা হলে যে তুই লোকে কী বলবে কী ভাববে বলে ঈশ্বরক্ষুধাও চেপে রাখবি।

'ঐ ছাখ, দূরে একটা নৌকো আসছে।' ঠাকুর বললেন উৎফুল্ল হয়ে।

'তা আসছে তো আসছে।'

'ঐটাতে নিশ্চয়ই গৌরদাসী।'

'আর সঙ্গে এক রাশ খাবার!' রাখাল পরিহাস করে উঠল।

নৌকোটা স্পষ্ট হল ক্রমে। সন্দেহ কি, দক্ষিণেশ্বরের ঘাটের

দিকেই আসছে। আর ঐ তো বলরাম দাঁড়িয়ে। আর, হ্যাঁ, ও কে? ও কে ভেতরে বসে?

সন্দেহ কি, গৌরদাসী।

আর তুই বলতে চাস গৌরদাসী খালি হাতে এসেছে?

গৌরীমা এক গামলা রসগোল্লা নিয়ে নামলেন।

'এবার? বল এল কিনা গৌরদাসী। খাবার নিয়ে এল কিনা।' ঠাকুর শিশুর মত লোভালু চোখে তাকালেন রাখালের দিকে: 'খা না কটা খাবি। খিদে পায় বলেই তো খাদ্য মধুর। তেমনি অনুরাগ আছে বলেই তো ভগবান আস্বাদ্য।'

এদিকে আবার দামোদরেরও খিদে পায়।

বাঘনাপাড়ায় এসেছেন গৌরীমা। বলদেবজীর মন্দিরের কাছে আছেন এক গাছতলায়। ধারেই পুকুর। দামোদরকে কণ্ঠে নিয়ে বসে আছেন ঘাটলায়।

গাঁয়ের এক বউ পুকুর থেকে শাক তুলে চলে গেল সুমুখ দিয়ে।

রাত্রে সেই বউ স্বপ্ন দেখল। দেখল একটি কালো ছেলে তাকে বলছে, 'হ্যাঁ গা, তুমি কেমনতরো লোক? অতগুলো শাক তুলে আনলে, আর আমি পুকুরধারে বসে, আমায় চারটি দিলে না?'

বউ বললে, 'তুই কে? তোকে তো কই দেখিনি তখন।'

'সে কী? দেখনি! গাছতলায় ঐ যোগিনী-মাকে দেখেছ? আমি তো ঐ যোগিনী-মায়ের কাছেই থাকি।'

আহা, ছেলেমানুষ, চারটি শাক খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, যোগিনী-মার ভয়েই চায়নি মুখ ফুটে। আহা, কী দুরন্ত শাসন না জানি ছেলের উপর।

পর দিন আবার শাক তুলেছে বউ, একটু বুঝি বেশি তুলেছে। গাছতলায় এসে গৌরীমাকে বললে, 'আচ্ছা যোগিনী-মা, আপনার এখানে কি একটি কালো ছেলে থাকে?'

'না। এখানে ছেলে কোথায়?' গৌরীমা অবাক হলেন: 'কেন, কী করেছে সে?'

'আমার কাছে কাল চারটি শাক খেতে চেয়েছে।'

'শাক? সে আবার কী!'

'তা হলে নেই এখানে কালো ছেলে?' বউও বিস্ময় মানল: 'আমাকে বললে, আমি তোমাদের যোগিনী-মায়ের কাছে থাকি।'

'বা, এখানে আছে এক কালো ছেলে।' আরেকটি মহিলা সেখানে ছিলেন, বলে উঠলেন: 'হ্যাঁ, কুচকুচে কালো, জ্বলজ্বলে চোখ। ভারি দুষ্টু, ভারি চঞ্চল, তাই না?'

'কী যে বলো তার ঠিক নেই।' গৌরীমা বিতৃষ্ণাভরা কণ্ঠে বললেন, 'এটা বাপু ছেলেপিলের সংসার নয়। এগিয়ে কোথাও গিয়ে দেখ, পাবে কালো ছেলে।'

'ওমা সে কি গো?' মহিলা দৃঢ়স্বরে বললেন, 'ঘরের মানুষকে চিনতে ভুল হচ্ছে? যার সঙ্গে এতকাল ঘর করছ সেই বঙ্কোবিহারী দামোদরকেই দূরে রাখলে?'

সকলের চমক ভাঙল। গৌরীমার দুই চোখ জলে ভরে উঠল। সন্দেহ কি, দামোদরই বালক বেশ ধরে শাক চেয়েছেন।

বউটি শাক দিয়ে গেল।

অভিমানে গৌরীমা দামোদরকে বললেন, 'কেন, আমি কি তোমাকে চারটি শাক খাওয়াতে পারতুম না? আমি কি এতই গরিব? পরের কাছে গিয়ে হাত পাতলে?'

দামোদর শাক চেয়ে খেয়েছেন, গাঁয়ে-গাঁয়ে রাষ্ট্র হয়ে গেল। দলে দলে লোক এল শাক নিয়ে। গাছ প্রায় ঢেকে গেল শাকের বোঝায়!
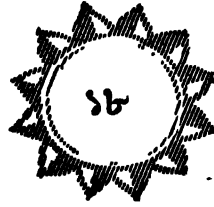
সবে ভোর হয়েছে।

ঠাকুর ডাকলেন গৌরীমাকে। বললেন, 'ছাখ গৌরী, আমি জল ঢালছি তুই কাদা চটকা।'

ফুল তুলছিলেন গৌরীমা। কথাটার তাৎপর্য হঠাৎ ভালো করে বুঝতে পারেননি। বললেন, 'এখানে কাদা কোথায় যে চটকাব। সবই যে কাঁকর।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'আমি কী বললুম আর তুই কী বুঝলি?'

গৌরীমা চমকে উঠলেন।

বকুল গাছের গোড়ায় জল ঢালছিলেন ঠাকুর, বাঁ হাতে একটি ডাল ধরা, ঠাকুর বললেন, 'এদেশের মায়েদের বড় দুঃখু, তাদের মধ্যে কাজ কর তুই।'

তার মানে, ঠাকুরের ভাবকে কাজে ফলিয়ে মেয়েদের সেবা করো। মেয়েরাই তো জ্যান্ত জগদম্বা। স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎসু।

'সংসারী লোকের সাথে আমার পোষাবেনা।' গৌরীমা আপত্তি জানালেন: 'আমার ধাতে সইবেনা হৈ-হৈ। বাছাই-করা কতগুলি মেয়ে আমার হাতে দাও, আমি তাদের হিমালয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ গড়ে দিচ্ছি।'

'না গো না,' ঠাকুর দৃঢ় হলেন : 'এই টাউনে বসে কাজ করতে হবে। এত নইলে তপস্যা করলি কেন? সেই তপস্যার ফল এবার মেয়েদের সেবায় লাগা।' কণ্ঠে বিষাদের স্পর্শ লাগল। বললেন, 'ওদের বড় কষ্ট।'

বলছেন বিবেকানন্দ : শাক্ত শব্দের অর্থ জানো? শাক্ত মানে মদভাণ্ড নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। আমেরিকানরা তাই দেখে। আমাদের মনু মহারাজও বলেছেন, যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী সেই পরিবারের উপরে ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তাই করে। এরা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী! আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।

একদিকে বিবেকানন্দ আরেকদিকে গৌরীমা। বিবেকানন্দের শিবজ্ঞানে জীবসেবা। গৌরীমার জগদম্বাজ্ঞানে মাতৃসেবা।

'দুহাজার, দশহাজার, বিশহাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে মদ্দ—বুঝলে? গৌর মা, যোগেন মা, গোলাপ মা কী করছেন? চেলা চাই, যে করে হোক। তাঁদের গিয়ে বলবে এ কথা, আর তোমরা প্রাণপণে চেষ্টা করো।' ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন স্বামীজি : 'গৃহস্থ চেলার কাজ নয়, ত্যাগী—বুঝলে? এক এক জনে একশো মাথা মুড়িয়ে ফেল—শিক্ষিত যুবক, আহাম্মক নয়—তবে বলি বাহাদুর। হুলুস্থুল বাধাতে হবে। হুঁকো ফুঁকো ফেলে কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে যাও। জায়গায়-জায়গায় সেণ্টার করো, খালি চেলা করো, মায় মেয়ে মদ্দ যে আসে দে মাথা মুড়িয়ে, তারপর আমি আসছি। মহা আধ্যাত্মিক বন্যা আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হবে—তাঁর কৃপায়—উত্তিষ্ঠত

জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত। গন্তব্যস্থলে না পৌঁছুনো পর্যন্ত থেমো না।'

ঠাকুর বললেন, 'এক একবার বাগবাজারে যাস। বলরামের বাড়িতে মায়েদের সভা ডাক, মায়েদের কাছে ভগবানের কথা বললে তাদের মধ্যে সহজে ভক্তির উদ্দীপন হয়।'

গৌরীমা তাই বলতে লাগলেন।

ঠাকুরের নির্দেশে গেলেন মণিমল্লিকের বাগানে। সেখানে ব্রাহ্মমহিলাদের ভিড়। তাদের কাছে সাকার-নিরাকার সম্বন্ধে বল।

সাকার-নিরাকার দুই সত্য। ঈশ্বর কৃষ্ণের মত মানুষের দেহ ধারণ করে আসেন, এও সত্য। আবার তিনি নানারূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকারও বলেছে, নিরাকারও বলেছে। সগুণও বলেছে, নির্গুণও বলেছে। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে আমি একটি জিনিস, জগৎ একটি জিনিস, তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বব ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন।

অত কথার দরকার কী? কী হবে মাথা ঘামিয়ে? নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বলো, হে ঈশ্বর, তুমি কেমন, সাকার কি নিরাকার, আমায় দেখিয়ে দাও। তুমি যাই হও, কৃপা করো, আমাকে দেখা দাও।'

এ সব কথা মেয়েদের বল, বুঝিয়ে দে।

প্রয়াগতীর্থে ত্রিবেণীর তটভূমিতে তপস্যা করছেন গৌরীমা। কে এ একাকিনী সন্ন্যাসিনী, সর্ব অঙ্গে দিব্যকান্তি, একটি নারী আকৃষ্ট হয়ে দাঁড়াল স্থির হয়ে।

ধ্যানশেষে গৌরীমা চণ্ডী পাঠ করতে লাগলেন। ঘণ্টার পর

ঘণ্টা কাটতে লাগল তবু সেই নারী স্থানত্যাগ করল না। দাঁড়িয়ে রইল নির্বিচল।

এমন সুন্দরও মানুষ হতে পারে! এমন প্রাণমাতানো কারো কণ্ঠস্বর হয়! জ্যোতিঃস্নানে সমস্ত পরিবেশ পবিত্র, শব্দঝঙ্কারে মধুময় হয়ে উঠেছে। তন্ময়ের মত দেখতে লাগল, শুনতে লাগল নারী। আর ভাসতে লাগল অশ্রুতে।

পাঠশেষে গৌরীমা তাকিয়ে দেখেন, সাবা গায়ে গয়না, এক রূপসী নারী তাঁর পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে আর কাঁদছে।

'কী হয়েছে, মা? কেন কাঁদছ?'

'আমার কি কোনো উপায় আছে?'

'নিশ্চয় আছে। সকলেব আছে। উপায় একমাত্র ভগবান।' গৌরীমা স্নেহভরা চোখে তাকালেন: 'কিন্তু মা, তুমি কে?'

'আমি অধম, আমি পতিত, আমি অকিঞ্চন। আমি পাপপঙ্কে নিমগ্ন।' নারী মিনতিতে গলে পড়ল: 'আমার কি শান্তি হতে পারে?'

'খুব পারে। কিন্তু মা, সে পথ বড় কঠিন।'

'যতই কঠিন হোক, আমি তা মেনে নেব।'

'মেনে নেবে? পারবে? এই সব বিষয়স্পৃহা ছেড়ে দিতে পারবে?'

'পারব।'

'তোমার কান্না দেখে আশ্বাস হচ্ছে।' বললেন গৌরীমা, 'যদি সত্যি সত্যি তোমার অনুতাপ এসে থাকে তা হলে ভয় নেই। বাসনা কামনার পথ ছেড়ে দিয়ে একমনে ভগবানকে ডাকো। তিনিই শান্তির পথে তৃপ্তির পথে টেনে নেবেন।'

'নেবেন?'

'নিশ্চয়ই নেবেন। পিছনের দিকে ফিরেও তাকিও না। শুধু

সামনে, আরো সামনে এগিয়ে চলো। প্রথমেই হৃষীকেশে চলে যাও। চলে যাও লোকালয়ের বাইরে। সেখানে গিয়ে সাধন-ভজনে ডুব দাও।'

গায়ের সমস্ত সোনার গয়না যমুনার জলে ফেলে দিল নারী। কেশভার দূর করে দিল। ধরল দীনহীনের বেশ। যাত্রা করল হৃষীকেশে।

হৃষীকেশে দীর্ঘকাল পরে আবার সেই নারীর সঙ্গে গৌরীমার দেখা। গৌরীমা প্রথমে চিনতে পারেননি, নারী নিজের থেকে এসে প্রণাম করল।

'চিনতে পাচ্ছনা, মা?'

'না তো।'

'আমি সেই প্রয়াগের হতভাগিনী। আপনি যাকে বলেছিলেন এগিয়ে যেতে, জৈব থেকে দৈবে, কামনা থেকে বৈরাগ্যে।'

'অনেক এগিয়ে গিয়েছ মা। ঈশ্বরই বাকি পথ টেনে নেবেন হাতে ধরে।'

বিপথগামিনী এক কূলবধূ মা-ঠাকরুণের কাছে এসেছে। ভিতরে ঢোকবার সাহস নেই, দরজার বাইবে দাঁড়িয়ে অবিরল কাঁদছে।

'মা, আমি আপনার কাছে আসারও যোগ্য নই।'

'মা বলে ডাকলে, মেয়ে হলে, অথচ কাছে আসতে পারবে না? কেন, বাধাটা কিসের?'

'মা, আমি পাপীয়সী, আমি কলঙ্কিনী—'

'তুমি আমার মেয়ে।' মা এগিয়ে এসে দুহাত বাড়িয়ে কুলবধূব গলা জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'মায়ের চোখে মেয়ে কি কখনো পাপীয়সী হয়? এস মা ঘরে এস।'

কূলবধূকে ঘরের মধ্যে টেনে নিলেন মা। বললেন, 'তোমাকে মন্ত্র দেব।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, তোমারই তো মন্ত্রের দরকার।' মা-ঠাকরুন অভয় দিলেন: 'মন্ত্রেই তোমার ত্রাণ হবে দেখ। যখনই তোমার চোখের জল ঝরেছে তুমি ঠাকুরের আশীর্বাদের অধিকারী হয়েছ। সব ঠাকুরের পায়ে সমর্পণ করে দাও, তা হলেই আর ভয় নেই।'

এক বারাঙ্গনা বৃদ্ধ বয়সে মার কাছে এসে বসে, তাতে ঠাকুরের আপত্তি। একদিন সে আপত্তি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করলেন। বললেন, 'আমার ইচ্ছে নয় ও তোমার কাছে আসে।'

'আমার কাছে আসবে না তো কার কাছে আসবে?' প্রশান্ত-কণ্ঠে মা বললেন, 'সারা রাস্তা দাবদাহের মধ্যে দিয়ে এসেছে এখন এই সায়াহ্নে মাঠের শেষ প্রান্তে এসে পেয়েছে বৃক্ষচ্ছায়া—বলো সেই ছায়ায় এসে সে বসবে না?'

স্বামীজি মাকে বলছেন, জ্যান্ত দুর্গা। বলছেন, 'বিশ্বাস বড় ধন, জ্যান্ত দুর্গার পুজা দেখাব, তবে আমার নাম।'

'বাপের কৃপা চেয়ে মার কৃপা আমার উপরে লক্ষগুণ বেশি। মাপ করবে, ঐ মায়ের দিকে আমি একটু গোঁড়া। মার হুকুম হলেই বীরভদ্র ভূতপ্রেত অসাধ্য সাধন করতে পারে। আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি যেই আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ করে পগার পার। তা হলে বোঝো। এই দারুণ শীতে গাঁয়ে-গাঁয়ে লেকচার করে লড়াই করে টাকার যোগাড় করছি, মায়ের মঠ হবে।'

গৌরীমাও স্বামীজির ধারাতেই ভেবেছেন। বলেছেন, মাতৃসেবা মহাযজ্ঞ সাধনের জন্যে আশ্রম চাই। আশ্রমেই মেয়েদের সার্থক ব্রহ্মবিদ্যার বিকাশ।

শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। শক্তির কৃপা না হলে কিছুই হবার নয়।
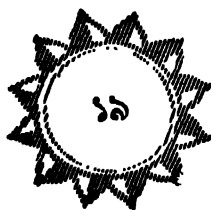
'হ্যাঁ মা, তোর একটা সাধনা যে এখনো বাকি আছে, সেটা এবার সেরে ফেলবিনে?' একদিন কাছে ডেকে এনে চুপিচুপি জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আর কী সাধনা!' গৌরীমা বললেন, 'তুমিই তো আছ, তোমাকেই তো পেয়েছি।'

'না, তোর পথ তপস্যার পথ। তোকে তপস্যা পুরোপুরি সম্পন্ন করতে হবে।'

'তা হলে সেই তো আবার দূরে যাওয়া।' গৌরীমার চোখ ছলছল করে উঠল: 'কীই বা হবে দূরে গিয়ে? যার গুরুপদে আছে মন, তার হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন। যার হেথা আছে তার সেথাও আছে।'

'তবু তুই যা। শেষ করে আয়। শোন, শেষ করে যত শিগগির পারবি ফিরবি। দেরি করবিনে।'

ঠাকুরের থেকে বিদায় নিয়ে গৌরীমা চলে গেলেন বৃন্দাবনে। তারই অদূরে, নির্জনে-গহনে তাঁকে সাধনা করতে হবে। একাসনে নয় মাস সাধনা। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস।

তবু যত কঠিন হোক কৃচ্ছ্র, ভারতীয় নারী, যার এক শ্রেষ্ঠ প্রতিমা গরীয়সী গৌরী, সে তাতে পশ্চাৎপদ নয়। সে সর্বশক্তিময়ী মহীয়সী।

পশ্চিমে নারীর যে পূজা তা নারীর রূপযৌবনের পূজা। আর শ্রীরামকৃষ্ণের নারীপূজা, নারীর মাঝে যে আনন্দময়ী মাতৃশক্তি প্রতিষ্ঠিত তাকে পূজা। সমাজ যাদের অস্পৃশ্য বলে দূরে ঠেলেছে, তাদের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়েছেন ঠাকুর, কাঁদতে কাঁদতে পদতলে পড়ে অর্ধবাহ্য দশায় বলেছেন, 'মা, একরূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে, আরেকরূপে তুমি সমস্ত জগতের অধীশ্বরী। তোমাকে প্রণাম করি মা, নিরন্তর প্রণাম করি।' নারীর মাঝে যে ঈশ্বরত্ব আছে কার সাধ্য তাকে ঠেকিয়ে রাখে? সংসারে এমন পাশব ভাব কী আছে যা পবিত্রতা ও সতীত্ব পারে না জয় করতে?

'মেয়েদের পুজো করেই সব জাতি বড় হয়েছে।' বলছেন স্বামীজি: 'যে দেশে যে জাতিতে মেয়েদের পুজো নেই, সে দেশ সে জাতি কখনো বড় হতে পাবে না, কস্মিনকালেও নয়। আমাদের জাতির এই যে অধঃপতন তার কারণ আমরা এইসব শক্তিমূর্তির অবমাননা করেছি।'

ঠাকুরের গলরোগ হয়েছে। শ্যামপুকুরে বড় ভাড়া করে রয়েছেন চিকিৎসার জন্যে। সেখান থেকে এসেছেন কাশীপুরে।

একদিন খাবার নিয়ে এসেছে মা, ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ গা, তুমি কি কিছুই করবে না?' নিজের দেহের দিকে ইঙ্গিত করলেন: 'এইই সব করবে?'

'আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?'

'না, না, আমার একার দায় নয়, তোমারও দায়।'

'সে দেখা যাবে।' মা পাশ কাটাতে চাইলেন: 'এখন খাবে, ওঠো।'

যেন অনেক দূর দেশ থেকে বেড়িয়ে আসছেন এমনি ভাবের ঘোর থেকে ঠাকুর বললেন, 'দেখ, কলকাতার লোকগুলো

যেন অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।'

'বা, আমি কী দেখব! আমি সামান্য মেয়েমানুষ।'

নিজের দেহের দিকে আবার ইঙ্গিত করলেন ঠাকুর: 'এ আর কী করেছে? তোমাকে এর চেয়ে ঢের ঢের বেশি করতে হবে।'

'সে যখন হবে তখন হবে। তুমি খাও তো আগে।'

ঠাকুর খেতে-খেতে বললেন, 'শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।' ঠাকুর তাকালেন স্নেহভরে। বললেন, 'সেই যে গানটা গাইতাম মনে আছে?'

মাঠাকরুণ সম্মতিতে ঘাড় নাড়লেন: 'আছে।'

'এসে পড়েছি যা দায়, সে দায় বলব কায়;
যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়?
হায় বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি,
বলতে নারি, কইতে নারি, নারী হওয়া এ কি দায়!'

কদিন পরেই বাহু থেকে সোনার ইষ্টকবচ খুলে ফেললেন ঠাকুর। মার হাতে দিয়ে দিলেন, বললেন, 'তুমি রাখো।'

সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। বুঝল ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের বুঝি আর দেরি নেই।

বলরামকে ডাকালেন ঠাকুর। বললেন, 'গৌরদাসীকে একবার খবর দিতে পারো?'

বলরাম তক্ষুনি চিঠি লিখল গৌরীমাকে। শিগগির ফিরে এস। ঠাকুর ডাকছেন।

'এতকাল কাছে থেকে শেষটায় দেখতে পেলে না।' ঠাকুর বললেন, 'তাকে দেখবার জন্যে আমার বুকের মধ্যে যেন বিল্লি আঁচড়াচ্ছে।'

আবার খবর পাঠাল বলরাম।

খিচুড়ি রাঁধছেন মা, তলাটা ধরে গেল। সন্তানদের উপরের ভাগ দিয়ে নিজে খেলেন পোড়াটা। ছাদে তাঁর শুকোতে দেওয়া দেশী শাড়িটা খুঁজে পাওয়া গেল না। জলের কুঁজোটা তোলবার সময় ভেঙে চুরমার।

কী রকম একটা বিপদের যেন ছায়া পড়েছে সংসারে।

শ্রাবণের মহানিশা। পূর্ণিমা রাত্রি। একটা বেজে ছয় মিনিট, ঠাকুর মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন।

ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর মা হাত থেকে সোনার বালা খুলে ফেলছেন, ঠাকুর হঠাৎ সশরীরে আবির্ভূত হয়ে মায়ের হাত চেপে ধরলেন। বললেন, 'আমি কি কোথাও গিয়েছি? এ তো শুধু এঘর আর ওঘর।'

সোনার বালা হাতেই রইল।

বলরাম থান কাপড় কিনে এনেছে। গোপাল-মাকে বললে, 'মাকে পরিয়ে দাও।'

'ওরে বাবা, এ শাদা থান কে তাঁর হাতে দেবে?' শিউরে উঠল গোলাপ-মা।

মা নিজের হাতেই শাড়ির পাড় ছিঁড়ে সরু করে নিয়েছেন।

সাধন শেষ করে বৃন্দাবনে ফিরেছেন গৌরীমা। কালাবাবুর কুঞ্জে উঠেছেন। ঐ কুঞ্জই তাঁর এদিককার ঠিকানা। কুঞ্জের কর্মচারীরা দিলে তাঁকে দুঃসংবাদ।

পিতৃহারা কন্যা, গৌরীমা মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

জ্ঞান হলে কর্মচারীরা তাঁকে বলরামের চিঠি দিলে।

'সে কী, ঠাকুরের এত অসুখ, আমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন, আর সে খবর আমাকে জানালেন না?'

'কী করে জানাব বলুন। আপনি তখন কোথায় কোথায় ঘুরছেন সাধন ভজনের জন্যে তা কি আমরা জানি?'

কর্মচারীদের দোষ কী। ঠাকুরই ইচ্ছে করে ফাঁকি দিয়েছেন। তাই এই ভাবে তাকে পাঠিয়েছেন বৃন্দাবনে। কঠিন অসুখেব কথা, দেখা করতে যাওয়ার কথাটিও জানতে দেননি।

এ দেহ আর রাখব না।

দারুণ অভিমানে 'ভৃগুপাতে' দেহত্যাগ করতে উদ্যত হলেন গৌরীমা।

সহসা তাকিয়ে দেখলেন সামনে ঠাকুর দাঁড়িয়ে। সেই দয়ানিধ দামোদর। নিরবদ্য নিরাময়।

'সে কী, তুই মরবি নাকি?' বললেন ঠাকুর, 'তোর এখনো কত কাজ।'

মরা আর হল না গৌরীমার। ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন ঠাকুরকে। প্রণামান্তে আর দেখতে পেলেন না। তোর এখনো কত কাজ! কাজ? তাহলে ফিরে যেতে হয়, উঠে দাঁড়াতে হয় বিষাদ থেকে।

কিন্তু কাজ কী ?

নরেনকেও বলেছিলেন, তোর কাজ আছে।

'পারব না কিছু করতে।'

'তোর ঘাড় করবে।'

'কিন্তু কাজটা কী?'

'লোকশিক্ষা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা।'

কিন্তু গৌরীমার কাজ কী?

'স্ত্রী-শিক্ষা। জগদম্বাজ্ঞানে স্ত্রী-জাতির সেবা।'

'এ কী কলঙ্কের কথা!' প্রথাসর্বস্ব মেয়ের দল মা-ঠাকরুনের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল: 'স্বামীর মৃত্যুর পরেও বামুনের মেয়ে হয়ে হাতে বালা রাখে, পেড়ে কাপড় পরে—ছি-ছি, এ কোনোদিন শুনিনি।'

মা-ঠাকরুনের ভক্তমেয়ের দলও উপযুক্ত উত্তর দিতে পারে না। থাকতেন গৌরীমা, ঠিক-ঠিক বুঝিয়ে দিতে পারতেন। সমস্ত প্রগল্‌ভতাকে পারতেন স্তব্ধ করে দিতে।

লোকমতকে আর উপেক্ষা করতে পারলেন না, মা-ঠাকরুন আবার হাতের বালা ধরে টান মারলেন।

আবার হাত ধরে ফেললেন ঠাকুর। বললেন, 'আমি কি মরেছি যে বিধবার বেশ ধরবে ?'

না, সত্যিই তো, তিনি কি মরেছেন ? তিনি কি পারেন মরতে ? এই তো তিনি আছেন তাঁর সামনে। স্পষ্ট, সুগোচর, সশরীর।

অভিভূতের মত তাকিয়ে রইলেন মা-ঠাকরুন।

ঠাকুর বললেন, 'গৌরী সব শাস্ত্র জানে। ওকে জিগগেস করো। ও বুঝিয়ে দেবে, তুমি চিরসীমন্তিনী।'

সধবার বেশ ত্যাগ করা হল না মার।

কিন্তু কোথায় গৌরী ?

মা-ঠাকরুন তীর্থভ্রমণে বেরুলেন। সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে ঠাকুরের ভাইঝি লক্ষ্মী, গোলাপ-মা আর মাস্টার মশায়ের স্ত্রী নিকুঞ্জবালা, আর পুরুষদের মধ্যে স্বামী যোগানন্দ, অভেদানন্দ আর লাটু মহারাজ ওরফে অদ্ভুতানন্দ।

বৈদ্যনাথধাম হয়ে কাশী। কাশী থেকে অযোধ্যা। অযোধ্যা থেকে বৃন্দাবনে যাচ্ছেন, ট্রেনের কামরায় ঘুমিয়ে পড়েছেন

মা-ঠাকরুন। জানলার পাশে হাতখানি তোলা, বাহুতে ঠাকুরের সেই ইষ্টকবচ।

'চলন্ত কামরার ওপাশে দেখা দিয়েছেন ঠাকুর। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছেন। ওগো, শুনছো? ডেকেছেন মা-ঠাকরুনকে।

চোখ মেলে সবিস্ময়ে তাকালেন মা-ঠাকরুন।

ঠাকুর বললেন, 'কবচটি যে সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে। দেখো, সাবধান, যেন না হারায়।

মা উঠে বসলেন। তক্ষুনি কবচটি খুলে ছোট টিনের বাক্সটিতে রেখে দিলেন। এই বাক্সেই ঠাকুরের নিত্যপুজোর ফটোখানি আছে। কবচটিও ওখানেই থাক। দরকার নেই বাহুতে ধারণ করে। ঠাকুর বারণ করলেন!

পৌঁছুলেন বৃন্দাবনে। কিন্তু গৌরী কোথায়?

লাটুকে বললেন, 'গৌরীর খোঁজ করো।'

'এ ছেলেটি বেশ।' বলেছিলেন ঠাকুর, 'এ তোমার ময়দা ঠেসে দেবে।'

সেদিন ঝাউতলার দিকে যাচ্ছেন, দেখলেন লাটু গঙ্গাতীরে নিশ্চল হয়ে ধ্যান করছে। ঠাকুর বললেন, 'ওরে লেটো এখানে বসে ধ্যান কচ্ছিস কী, ভগবতী যে নবতে রুটিবেলার লোক পাচ্ছেন না।'

মায়ের রুটি বেলাই দ্রুততম তপস্যা।

একেক মন্দিরে ঘোরে আর মাকে এসে খবর দেয়, গৌরীদিদির দেখা পেলাম না।

রাওলে রাধারাণীর জন্মস্থান দেখতে গিয়েছে যোগানন্দ, হঠাৎ নজরে পড়ল অদূরে, ফাঁকায়, একখানি গৈরিক কাপড় রোদে শুকোচ্ছে। এখানে গেরুয়া কেন? কেমন কৌতূহল হল যোগানন্দের। এগুলো, কী ব্যাপার? কে এখানে সন্ন্যাসী?

এগিয়ে গিয়ে দেখল একটা গুহার মধ্যে গৌরীমা বসে আছেন। যোগারূঢ়া, ধ্যানাচ্ছন্না। গভীরগতা।

লেশমাত্র চ্যুতি ঘটে, যোগানন্দ ফিরে গেল মার কাছে। বললে, 'তোমার গৌরমণিকে পেয়েছি।'

মা-ঠাকরুন নিজে গেলেন সেই গুহায়। কী জ্বলন্ত-জয়ন্ত তপস্যা করছে নাজানি গৌরদাসী। চলো দেখে আসি তাকে। নিয়ে আসি।

'গৌরদাসী গো—'

গৌরীমা মার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শোক উত্তাল হয়ে উঠল।

কিন্তু কিসের শোক? 'আমি কি গেছি গা?' শুধু একটা ঘরের চৌকাঠ। শুধু একটা ক্ষণিকের যবনিকা।

ক্রমেই শান্ত হল দুজনে।

'এখন বলো শাস্ত্রের কথা।' মা-ঠাকরুন বললেন, 'ঠাকুব আমাকে বিধবার বেশ পরতে বারণ করে দিয়েছেন। বলেছেন এর ব্যাখ্যা যদি জানতে চাও গৌরদাসীকে জিগগেস কোরো। সে শাস্ত্র জানে, সে বুঝিয়ে দেবে তাৎপর্য। এখন বলো তুমি—'

'ঠাকুর বলেছেন, এটাই সমস্ত শাস্ত্রের বেশি। ঠাকুরের কথার উপরে খাটে না অন্য শাস্ত্র। আমাদের অন্য শাস্ত্রে দরকার কী।'

'না, না, শাস্ত্র মিলিয়ে নিতে হবে।'

গৌরীমা গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ঠাকুর নিত্য বর্তমান। তাঁর নিত্যলীলার বিরাম নেই কোনোখানে। আর তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী। তোমার বিচ্ছেদ নেই কোনোকালে। অতএব তুমি চিরভর্তৃকা, চিরসধবা। তুমি যদি সধবার বেশ ত্যাগ করো, জগৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। সমস্ত আকাশে একবিন্দু আনন্দ থাকবে না।'

'ঠাকুর তোমাকে কী বলে গিয়েছেন জানো?'

গৌরীমা সমস্ত অস্তিত্বকে শ্রুতিমান করে রইলেন।

'বলে গেছেন, জীবনকে জ্যান্ত জগদম্বাদের সেবায় লাগা।'

'হ্যাঁ, মা, কাদা চটকাতে বলে গেছেন। আমার মনে আছে।' বললেন গৌরীমা, 'তাঁর ভাব আর আমাদের মূর্তি। তাঁর ভাব দিয়েই প্রাণময়ী মূর্তি গড়ে তুলব। আবার সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর আবির্ভাব হবে। আবার গার্গী মৈত্রেয়ী লীলাবতী জন্মাবে। জন্মাবে অহল্যাবাই, মীরাবাঈ, ঝাঁসির রাণী।'

কী বলছেন স্বামীজি ?

বলছেন, 'এ সীতাসাবিত্রীর দেশ। পুণ্যক্ষেত্র ভারতে মেয়েদের যেমন চরিত্র, যেমন সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি, এ আর পৃথিবীর কোনো দেশে দেখলাম না। যখনই আমরা কোনো আদর্শ রমণীর কথা ভাবি, মাতৃভাবের কথাই আমাদের মনে আসে। মাতৃত্বেই তার আরম্ভ, মাতৃত্বেই তার শেষ। মায়ের জন্যেই আমরা বলিপ্রদত্ত। আমাদের এই সমাজ-সংসার সেই বিরাটেশ্বরী মহামায়ার ছায়ামাত্র।'

আরো বলছেন :

'মনে রাখবে মেয়ে-পুরুষ দুইই চাই—আত্মাতে মেয়ে-পুরুষের ভেদ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বললেই হয় না—শক্তির বিকাশ চাই, হাজার হাজার পুরুষ চাই স্ত্রী চাই, তারা হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী, উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু, আগুনের মত ছড়িয়ে পড়বে। পবিত্রতার হোমশিখার মত। দেশের যথার্থ কল্যাণের জন্য কতগুলি পবিত্রজীবন ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীর দরকার হয়ে পড়েছে। ব্রহ্মচর্য ও ব্রহ্মবিদ্যার শুধু পুরুষেরই অধিকার নয়, মেয়েদেরও অধিকার। ব্রহ্মচর্যই প্রধান ধর্ম।'

রাত্রে গুহার মধ্যে ধুনি জ্বেলে বসেছেন মা-মেয়ে, সারদামণি আর গৌরীমা—দুটো সাপ এসে উপস্থিত।

'ও গৌরদাসী, কী হবে গো? ছুটো সাপ যে।' মা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন।

'ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করতে এসেছে।' স্মিতস্নিগ্ধ মুখে বললেন গৌরীমা, 'কিছু ভয় নেই, মা। প্রসাদ পেয়েই চলে যাবে এখুনি।'

এককোণে দামোদরের খানিকটা প্রসাদ—দুধ-কলা ঢেলে দিলেন গৌরীমা। দিব্যি তা খেয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল সাপ দুটো।

'তুমি সাপের সঙ্গে বসবাস করো?' মা-ঠাকরুন গৌরীমার হাত চেপে ধরলেন : 'তোমার কী দুর্দান্ত সাহস।'

'সবই মা তোমার থেকে।'

সেদিন মা একাকিনীই চলে গেলেন 'ধীর সমীরে।'

কালাবাবুর কুঞ্জে, মার ডেরায়, মাকে দেখতে না পেয়ে সকলে খুঁজতে বেরুল। চলো বঙ্কুবিহারীর মন্দিরে, চলো বা মদনমোহনের সকাশে। কেউ বললে, কালীয়দমনের মন্দিরটাও দেখে এস।

'ধীর সমীরে' এসে গৌরীমা দেখলেন মা সমাধিস্থ হয়ে বসে আছেন। গোবিন্দানন্দিনী গোবিন্দগতমানসা রাধিকার ভাবমূর্তি।

'গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী।
নির্মল-উজ্জ্বলরস—প্রেমরত্ন-খনি॥
'অধিরূঢ়—মহাভাব সদা রাধার প্রেম।
বিশুদ্ধ নির্মল যেন দশবাণ হেম॥'

মহাভাবই প্রেমের শেষসীমা। আর এই 'ভাবের অবধি' রাধিকায়। রাধিকার প্রেমই বিবর্ধিত, স্বসুখবাসনাশূন্য, সর্বোত্তম। রাধিকার প্রেমেই কৃষ্ণমাধুর্যের পরিপূর্ণ আস্বাদ। রাধিকাই কৃষ্ণ-সুখের একমাত্র হেতু। সুখবাসনা না থাকা সত্ত্বেও শতগুণ সুখ। বিষামৃতে একত্র মিলন। বাহ্যে বিষজ্বালা, অন্তরে নিরন্তর মধু।

গৌরীমা রাধানাম গাইতে লাগলেন। যোগানন্দও মেলাল তার কণ্ঠ।

বাহ্যচেতনা ফিরে পেয়ে মা জিগগেস করলেন: 'এ আমি কোথায়?'

এ নদী কী? এ কি রামের সরযূ, কৃষ্ণের যমুনা, না কি রামকৃষ্ণের গঙ্গা?

সেদিন নৌকোয় বেড়াচ্ছেন মা, হঠাৎ যমুনায় কাকে দেখতে পেয়ে দুহাত বাড়িয়ে ঝাঁপ দিতে গেলেন। পলকে গৌরীমা ও গোলাপ-মা ধরে ফেললেন তাঁকে।

'ঠাকুর বলেছেন ঘন-ঘন ভাবসমাধি হলে নরদেহ ভেঙে যায়।' বললেন গোলাপ-মা, 'তুমি শান্ত হবে বলে বৃন্দাবনে নিয়ে এলুম, এখন দেখি উলটো হল। তুমি যদি এমনি উন্মনা হয়ে থাকো তবে তোমাকে দেশে ফিরিয়ে নেব কী করে?'

'কোনো ভয় নেই গোলাপ,' বললেন গৌরীমা, 'এতেই মা বেশি শান্তি পাচ্ছেন।'

'বাবা, তোমাকে অনেক মাধুকরী দেব।' বৃন্দাবনে এক সাধুকে ধরলেন গোলাপ মা, 'তুমি এমন কিছু করতে পারো যাতে আমার মায়ের শোকের নিবারণ হয়?'

সাধু হাসল। বললে, 'ঐ মায়ের আবার শোক কী? যাঁকে ছুঁলে সর্বশোকের বিনাশ হয় তাঁর শোক বলে কিছু থাকতে পারে?'

'তবে আমার মা সব সময়ে অমনটি হয়ে থাকেন কেন?'

'ঐ মায়ী যে সব সময়ে ওঁর পীতমকে দেখতে পান। তাই অমন আনমনা হয়ে থাকেন। কোনো ভয় নেই', সাধু বললে আশ্বাসের ভঙ্গিতে, 'আর কদিন থাকবেন এমনি ভাবে তারপর দেবেন উজাড় করে।'

গৌরীমা ও অন্যান্য সন্তানসহ বৃন্দাবনধাম পরিক্রমা করলেন মা।

একটি মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে। মা বললেন, 'দেখ দেখ

মানুষটি কেমন বৃন্দাবনপ্রাপ্ত হয়েছেন। আমরা এখানে মরতে এলুম, তা একদিন একটু জ্বরও হলনা। কত বয়স হয়ে গেল বলো তো। আমরা বাপকে দেখেছি, ভাসুরকে দেখেছি।'

যোগীন-মা হেসে উঠলেন। বললেন, 'বল কী মা, বাপকে দেখেছ? বাপকে আবার কে না দেখে!'

পরিক্রমার সময় ব্রজের পথ-ঘাট দেখছেন সজাগ হয়ে। যেন কবেকার চেনা জায়গা! যেন কতকাল আগে থেকে গিয়েছেন এখানে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ছেন।

'কী মা, কী দেখলে? কাকে দেখলে?'

'না, কিছু না। চলো। চলো।'

মথুরা আক্রান্ত হলে তার তিন বিগ্রহ গোপীনাথ, গোবিন্দ আর মদনমোহন অন্যত্র প্রস্থান করল। গোপীনাথ আর গোবিন্দ গেল জয়পুরে আর মদনমোহন কড়ৌলিতে।

মার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে গৌরীমা আর যোগীন-মা গেলেন মদনমোহন দেখতে।

কড়ৌলিতে পৌঁছুবার আগেই সন্ধে হয়ে গেল। পথের মধ্যেই বিশ্রাম না করে উপায় নেই। মাঝখানে জিনিস-পত্র রেখে শুয়েছেন দুজনে। একটা লম্বা দাড়িওয়ালা লোক কতক্ষণ ধরে ঘুর-ঘুর করছে। মতলোব ওরা ঘুমিয়ে পড়লেই সটকান দেবে মাল নিয়ে। গৌরীমা গায়ের আলখাল্লার পকেট থেকে সন্তর্পণে দেশলাই বের

করে চুপ করে রইলেন, ভাব করলেন যেন ঘুমের অতলে তলিয়ে গিয়েছেন। চোর না সাধু কে জানে, মাথার কাছে এসে ঝুঁকল, পুঁটলিটা আলগা করে টেনে নেবে আলগোছে। ফস করে দেশলাই জ্বালালেন গৌরীমা, আর চোরের ঝুলন্ত দাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। দাউ-দাউ করে দাড়ি জ্বলে উঠল। দুই হাতে দাড়ি চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটল চোর। ধর ধর—মার মার শব্দে গৌরীমাও লাফিয়ে উঠলেন। যারা গোলমাল শুনে জাগল তারা চোর ধরবে কি, তারা চোরের দাড়ি পুড়েছে জেনে হাসতে লাগল।

মাকে নিয়ে হরিদ্বার হয়ে জয়পুরে এলেন গৌরীমা। আর জয়পুর থেকে প্রয়াগে।

প্রয়াগে এসেছেন মা দুই অভিলাষ নিয়ে। এক, মস্তকমুণ্ডন করে কেশদাম ত্রিবেণীসঙ্গমে বিসর্জন দেবেন আর ঠাকুরের চুলও উৎসর্গ করবেন মুক্তধারায়।

প্রভাতে যাবেন ত্রিবেণীতে, হঠাৎ শুনতে পেলেন ঠাকুরের কণ্ঠ। বলছেন, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী। উচ্চকিত হয়ে তাকালেন মা। দেখলেন দুহাতে দরজা ধরে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। মুখখানি কাতর, বিষণ্ণ, স্বরেও বেদনা মাখানো।

দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কী ব্যাপার?' বুঝতে পেরেছেন মা-ঠাকরুন। তাঁকে মস্তক মুণ্ডন করতে নিষেধ করছেন। তোমার সঙ্গে আমার নিত্য মিলনোৎসব, তুমি আমার অশেষ সৌভাগ্যলক্ষ্মী—তুমি কেন দারিদ্র্য-বেশ ধরবে, তুমি কেন থাকবে বঞ্চিতের মত, হৃতসর্বস্বের মত?

'ঠাকুর কাকে ডাকলেন বলতে পারো?' মা জিগগেস করলেন গৌরীমাকে।

কে একজন বললে, 'লক্ষ্মীকে।'

'না, ঠাকুর তোমাকেই ডেকেছিলেন।' বললেন গৌরীমা, 'তুমিই যে তাঁর গোলোকে রাধা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী।'

ত্রিবেণী থেকে গৌরীমা ফিরে এলেন বৃন্দাবনে। মা দলবল নিয়ে ফিরে গেলেন কলকাতায়।

কলকাতায় বলরামমন্দিরে দিনকতক থেকে মা চলে গেলেন স্বামীর ভিটেয়, কামারপুকুরে। গেলেন তো আর আসেন না কলকাতায়। গ্রামে রব উঠল, কলকাতায় গদাধরের শিষ্যদের সঙ্গে থাকবে কী করে? মা-ও সমাজের ভয়ে সায় দিয়ে গেলেন।

'কিন্তু এখেনে তোমাকে দেখবে কে?' লাহাবাবুদের বোন প্রসন্নময়ী বোঝাতে এলেন: 'গদাধরের শিষ্য তো তোমারও শিষ্য, তোমারও সন্তান। তোমার প্রয়োজনে গাঁয়ের লোক তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। যদি দেখে তোমার ছেলেরাই দেখবে। ওদের ডাকে তুমি নিঃসঙ্কোচে চলে যাও কলকাতা। কত কাজ তোমার সেখানে।'

তবু বুঝি মায়ের দ্বিধা কাটে না।

এমন সময় কলকাতায় উপস্থিত হলেন গৌরীমা। আর দেখতে পাব না ঠাকুরকে শুনতে পাব না তাঁর কথা, এ কোথায় এলাম? কোথায় আমার দক্ষিণ-ঈশ্বর?

কালীঘাটে গেলেন মাকে দর্শন করতে। মাকে দেখছেন আর কাঁদছেন নিরর্গল, দেখলেন মায়ের বদলে শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে। দুই চোখে অপার শান্তি আর করুণা। মৃদু মৃদু নাড়ছেন ডান হাত, শোকাপ্লুতা মেয়েকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আমি কি কোথাও গেছি রে? আমি এই তো তোদের সামনে দাঁড়িয়ে।

স্বামীজি বললেন গৌরীমাকে, 'তুমি এবার যাও কামারপুকুর, মাকে নিয়ে এস।'

গৌরীমা নিয়ে এলেন মাকে।

মা বললেন, 'শ্রীক্ষেত্রে যাব।'

'আমি আবার হিমালয়ে।'

গৌরীমা চললেন ফের যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী গোমুখীর উদ্দেশে। দুর্গম আর দুরূহই শুধু আমাকে ডাকে। আমাকে ডাকে বন্ধুর ও বিপন্ময়। অতলস্পর্শ গিরিগহ্বর। নইলে বুঝব কী করে তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, আমাকে রক্ষা করছেন বিপদ থেকে ?

টিহরির রাজসরকার গৌরীমাকে অর্থসাহায্য করতে চাইলেন। বললেন, সরকারী প্রহরী দিই, আপনার দেখাশোনা করবে। বিনয়ে-বিশ্বাসে বললেন গৌরীমা, 'যিনি ঘরের বাইরে টেনে এনেছেন তিনিই দেখবেন অহর্নিশ। যাঁর বোঝা তিনিই বইবেন।'

গঙ্গোত্রী পার হয়ে নীলপদ্মের সন্ধান পেলেন গৌরীমা। যেমন বড় তেমনি সুগন্ধি। তেমনি লাবণ্যমনোহর! একটি দিয়ে পুজো করব কেদারনাথের আরেকটি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে দেব।

বলছেন স্বামীজি, 'ভারতের পক্ষে প্রয়োজন তার জাতীয় ধমনীর মধ্যে নব বিদ্যুদগ্নিসঞ্চার।' গৌরীমা সেই বিদ্যুদগ্নি।

'প্রভুর কৃপায় রণে বনে পর্বতমস্তকে তোমাদের কোনো ভয় নেই। শ্রেয়াংশি বহুবিঘ্নানি। এ তো হবেই। অতি গম্ভীর বুদ্ধি ধারণ করো।' গৌরীমা সেই গম্ভীরবুদ্ধি।

'হে বীর, স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ কর, হীনবুদ্ধি কামকাঞ্চনাসক্তদের উপেক্ষা করে যাও।' গৌরীমা সেই মূর্তিমতী উপেক্ষা।

'বাঙালি ঘরের মেয়ে হয়ে কী করে এত সব পাহাড়-পর্বত ডিঙোলেন ?' উত্তরকাশীতে কে একজন জিগগেস করল গৌরীমাকে।

গৌরীমা বললেন, 'শক্তই শক্তকে টানে, তেজীই তেজীকে শ্রদ্ধা করে। যিনি প্রাণের মধ্যে সঙ্কল্প তিনিই কর্মের মধ্যে উদ্‌যাপন।'

মা-ঠাকরুন বললেন, 'গৌরদাসীর মত কঠোর তপস্যা এ কালে কারু ধাতে সইবে না।'

বৃন্দাবনে স্বামীজির সঙ্গে দেখা গৌরদাসীর।

'তোমার নিত্যপূজার ঠাকুরের ফটোখানি দাও তো।'

'কেন ?'

'হাতরাসের স্টেশন-মাস্টার শরৎ গুপ্তকে দীক্ষা দেব।' আনন্দে উদ্বেল স্বামীজি : 'শোনো গৌরমা, শরৎই আমার প্রথম মন্ত্রশিষ্য।'

গৌরীমা দিলেন ফটো। সেই পটের সামনেই দীক্ষা হল শরতের। নাম হল স্বামী সদানন্দ।

ঘুরতে-ঘুরতে ফের ফিরে এলেন কলকাতায়। গঙ্গোত্রীর জল নিয়ে এসেছেন, তার কতক দিয়ে ঠাকুরের স্নানপূজা হবে, আর কতক রেখে দিলেন যখন রামেশ্বরে যাবেন তখন দেবেন মহাদেবকে।

ঠাকুরের সন্তানেরা বরানগরে ভাড়াবাড়িতে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন শুনে গৌরীমা গেলেন বরানগর। কিন্তু গিয়ে খেয়াল হল মঠে তো মেয়েমানুষদের প্রবেশ নিষেধ। তখন তিনি গঙ্গাতীরে গিয়ে বসলেন। গঙ্গাস্তোত্র উচ্চারণ করলেন। 'অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু কৃপাময়ি কাতর-বন্দ্যে।'

শশীমহারাজের চোখ পড়ল হঠাৎ। এ কী, গৌরমা না ? ওখানে কেন ? মঠে চলুন।'

'না। বিধিনিষেধের মর্যাদা রাখা উচিত।' বললেন গৌরীমা, 'শোনো এই গঙ্গোত্রীর জল নিয়ে যাও, ঠাকুরের স্নানপূজো কোরো।'

মঠে গিয়ে শশী গুরুভাইদের কাছে বললেন ব্যাপারটা।

বিবেকানন্দ ছুটে এলেন।

'সে কী, মঠে চলো শিগগির। তুমি কি মেয়েমানুষ ?'

'বলো কী, মেয়েমানুষ নই আমি ?' হাসতে লাগলেন গৌরীমা।

'না, নও। কী বলতেন ঠাকুর ? মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয় সে আর মেয়ে নয়, সে পুরুষ। তা ছাড়া, তুমি যদি মেয়েমানুষই হও, তুমি আমাদের মা।'

গৌরীমার আর আপত্তি টিকলনা। প্রবেশ করলেন মঠে।

কিন্তু এ কী, রাখাল লোহার কড়া মাজছে! ঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল, যাকে ঠাকুর কোলে-কাঁধে করেছেন, খাইয়ে দিয়েছেন নিজের হাতে, তার এই কষ্ট ?

মা, কষ্ট কোথায় ? পরম সুখ। সঙ্ঘের মধ্যে থেকে ঈশ্বরসঙ্গ। সঙ্গসুখ তো বটেই, সঙ্ঘসুখ।

'সরো, আমি মাজছি।' গৌরীমা বাধা দিতে গেলেন।

'না, না, আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।' স্বামী ব্রহ্মানন্দ আপত্তি করতে চাইলেন।

'কিন্তু মা সামনে থাকতে এ হবার নয়।' গৌরীমা কড়া কেড়ে নিলেন, নিজেই সুরু করলেন মাজতে।

মা, কত তীর্থকে তীর্থ করে এলে ? করলে কত তপস্যা ?

অর্জুনকে কী বলছেন ভগবান ? ভগবান বলছেন, শ্রুতি স্মৃতি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়নই করো, বহু-বহু দেবতার অর্চনা করো, আত্মজ্ঞান ছাড়া সব কর্ম নিরর্থক। কোটি কোটি সদাচার করো, পর্বত-প্রমাণ দান করো, আত্মতত্ত্ব না জানলে মোক্ষ নেই। তীর্থভ্রমণে নেই, নেই ভস্মলেপনে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহে, নেই উপবাসে-বনবাসে, নেই বা মৌনে-ধ্যানে নির্জনসেবায়। যতদিন বিবেক দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত না হবে, যতদিন সন্ন্যাসযোগ বিষয়ে দক্ষতা না জন্মাবে, ততদিন জীবব্রহ্মৈক্যবুদ্ধি স্থির হবে না।

সুতরাং সচ্চিদানন্দ লাভের জন্যেই তপস্যা।

'আর ঠাকুর কী বলতেন? বলতেন, 'যেখানে জপ-তপ-ধ্যান-ধারণা ব্রহ্মবিচার দীর্ঘকাল ধরে হয়, সেখানেই ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ ঘটে, ঈশ্বরীয় ভাব জমাট বাঁধে, সেই জন্যে তীর্থে সহজেই মন বসে, দর্শনলাভ হয়। সেই জন্যে মানতে হয় স্থান-মাহাত্ম্য। যদিও তিনি সর্বত্র আছেন, তবু সাধুর হৃদয়ে, দেবালয়ে, তীর্থে তাঁর আবির্ভাব বেশি।'

গৌরীমা সন্তানদের জগাখিচুড়ি রেঁধে খাওয়ালেন।

মা-ঠাকরুন কোথায়? মা-ঠাকরুন জয়রামবাটিতে। গৌরীমা তখুনি ছুটলেন মায়ের পদপ্রান্তে।
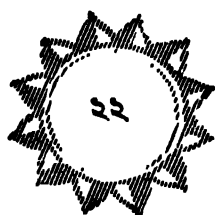
জয়রামবাটির জমিদার শম্ভু রায়ের বাড়িতে পদ্মফুল তুলতে গিয়েছেন গৌরীমা।

'কার জন্যে ফুল, মা?' জিগগেস করলেন শম্ভু রায়।

'ব্রহ্মময়ীর জন্যে।'

'সে আবার কে?'

'ও মা, তাকে চেননা? সে যে তোমার খাসতালুকের প্রজা।' গৌরীমা গাঢ়স্বরে বললেন, 'যিনি রাজেন্দ্রাণী মাহেশ্বরী তাঁকে তুমি প্রজারূপে পেয়েছ, তোমার কী ভাগ্য!'

'তুমি কার কথা বলছ মা?'

'কাঙালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন কিনা, তাই রাজরাজেশ্বরীকে কেউ চিনতে পারছে না। তিনি অত ক্লেশকষ্ট করছেন কেন? গৃহীদের গার্হস্থ্য ধর্ম শেখাবার জন্যে। চলো

দেখবে তাঁর কী সে অসীম ধৈর্য, অসীম করুণা, অভিমানের লেশমাত্র নেই। সে কী মহাশক্তি!'

শম্ভুনাথ তখুনি চলল মাতৃদর্শনে। আর দেখামাত্রই মার ভক্ত হয়ে গেল।

সব মেয়ের মধ্যেই এই মাতৃশক্তি। সেই শক্তিকে উদ্বোধিত করার ব্রতই গৌরীমার। সেই পরাবিদ্যার প্রকাশের জন্যেই এই দেহ-মন্দির।

ভায়েদের সংসারে মায়ের বিষম খাটনি। গৌরীমা দেখলেন ভাজেদের মধ্যে কেউ যদি মায়ের মন্ত্রশিষ্যা হন তা হলে ঠাকুরসেবার সুবিধে হয়, মার পরিশ্রমের কিছু লাঘব ঘটে।

মায়ের ভায়েদের মধ্যে বড় প্রসন্ন। দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে, বউয়ের নাম সুবাসিনী। বয়সে ছোট, তাই হয়তো কথা শুনবে।

'আমাদের মা-ঠাকরুনকে তুমি সামান্য ঠাকুরঝি মনে কোরো না।' সুবাসিনীকে বললেন গৌরীমা। 'তিনি সাক্ষাৎ মা সীতা, মা ভগবতী।'

গৌরীমাকে শ্রদ্ধা করত সুবাসিনী। স্তব্ধ বিস্ময়ে সে তাকিয়ে রইল।

'আমি বলি কী, তুমি মা-ঠাকরুনের কাছে দীক্ষা নাও।' বললেন গৌরীমা, 'তাঁর কৃপা হলে তোমার ইহকাল-পরকালের কল্যাণ হবে।'

'আমাকে দীক্ষা দিলে তাঁর কী লাভ?'

'তাঁর লাভ?' গৌরীমা হাসলেন: 'হ্যাঁ, লাভ বৈ কি, তোমার হাতের সেবাযত্ন পাবেন, তুমি থাকতে তাঁকে আর রান্না-ভাঁড়ার নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। তুমিই সব ভার নেবে। কি, নেবে?'

'নেব।'

মার কাছে কথাটা পাড়লেন গৌরীমা।

মা বললেন, 'ঘরে মন্ত্র দেব না।'

'সে কী?' গৌরীমা অবাক হলেন: 'অন্তত তোমার বলতে একজন থাক। নইলে কে তোমারটা করবে বলো দেখি?'

অগত্যা মা রাজি হলেন। দীক্ষা দিলেন সুবাসিনীকে।

কামারপুকুরে আছেন মা, সুবাসিনী কিছু ফুল আর মিষ্টি পাঠিয়ে দিল মাকে। মা খুব খুশি। বললেন, 'এ সংসারে কেউ আমার তত্ত্ব করে না। এই একটিই করে।'

ঘরের আবর্জনা সাফ করতে গিয়ে একতাড়া পুরোনো কাগজপত্র বার করে দিয়েছেন মা-ঠাকরুন। সেই স্তূপের থেকে পঞ্চাশ-ষাট টাকার এক তাড়া নোট আবিষ্কার করল সুবাসিনী। ফিরিয়ে দিল মার হাতে।

মা সুবাসিনীর চিবুক ধরে চুমু খেলেন। বললেন, 'গৌরদাসী এইটি আমার করে দিয়ে গিয়েছিল। সেয়ানা মেয়ে গৌরদাসী।'

সুবাসিনী একদিন বললে মাকে, 'সাধন ভজন কিছু হচ্ছে না, মা।'

মা বললেন, 'তুই এই যে কাজ করছিস সংসারে, এতেই সাধন হচ্ছে। এর চেয়ে আর কী সাধন ভজন আছে বল।'

'কই কাজও তো সব বোঝা মনে হচ্ছে।'

'ঠাকুরকে বল, ভক্তি দাও। ভক্তিলাভেই সমস্ত লাভ।'

সুবাসিনীর ছোট মেয়ে বিমলার পা ফুলে প্রচণ্ড জ্বর হয়েছে। মা ডাক্তার ডাকলেন। দেখে-শুনে ডাক্তার ওষুধ দিয়ে বললে, 'আপনি বললেন বলেই দিলুম এক দাগ ওষুধ। ধাত নেই—ওষুধ গড়িয়ে পড়ে গেল।

সুবাসিনী মায়ের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল—আমার কী হবে? যে করে পারো ভালো করে দাও আমার মেয়েকে।

পরের দিন জগদ্ধাত্রী পুজো, মা-ঠাকরুন দেবীর উদ্দেশে বললেন যুক্ত করে, 'কাল তোমার পুজো হবে মা, আর বড় বউ হাউ-হাউ

করে কাঁদবে এটা কি উচিত হবে? তুমিও কি শান্ত মনে পারবে পুজো নিতে?'

বিমলার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন মা-ঠাকরুন।

ভোর হলে দেখা গেল বিমলার অবস্থা ভালোর দিকে।

গ্রামের কোনো কোনো ছেলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দীক্ষা নিল মায়ের থেকে। এই নিয়ে গ্রামে বিরুদ্ধ আন্দোলন সুরু হল। সমর্থ ছেলেগুলো শেষে সাধু হয়ে যাবে! এ কী উৎপাত! সাধু হলেই তো জাত গেল! উনি এসে কি শেষকালে ভদ্রলোকদের জাত মারবেন নাকি?

'দেখ দেখি তো গৌরদাসী', গৌরীমার কাছে মা-ঠাকরুন খেদ করছেন: 'আমার কাছে এলে নাকি লোকেদের জাত যাবে? ছেলেরা ঈশ্বরলাভের উন্মাদনায় সন্ন্যাস নিচ্ছে তার আমি কী করব!'

'তোমার কাছে সন্ন্যাস পাওয়া তো বহুজন্মের ভাগ্যের কথা। আর জাত?' গৌরীমা আর্তমুখে বললেন, 'জাত-পাতের যিনি মালিক তাঁর কাছে এলে জাত যাবে কে বলে এমন কথা? যাক, আমি যাচ্ছি। ভেট করছি গে সমাজপতিদের।'

গলায় তাঁর দামোদরকে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন গৌরীমা।

দীক্ষা-পাওয়া এক সংসারী সন্তানের সঙ্গে রাস্তায়ই দেখা হল গৌরীমার।

সন্তান বললে, 'শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা নিয়ে আমি আমার শ্বশুরের বিরাগভাজন হলাম।'

'কেন, কী হল?'

'বড় ইচ্ছে স্ত্রীকে এনে মাকে একবার দেখাই। কিন্তু শ্বশুর আটকেছেন আমার স্ত্রীকে। কিছুতেই যেতে দিচ্ছেন না মার কাছে। আর আমাকে শাসাচ্ছেন।'

'আমার সমস্যা আরো কঠিন।' বললে আরেক দীক্ষিত সন্তান।

'তোমাকে একা তোমার শ্বশুর শাসাচ্ছে আর আমাকে শাসাচ্ছে গ্রামের মাতব্বরেরা—জোট বেঁধে। ভিটে-মাটি চাটি না করে।'

'দাঁড়াও, আমি সকলের সঙ্গে মোকাবিলা করছি। চলো আমার সঙ্গে।' গৌরীমা কোমর বাঁধলেন: 'ডাকো মোড়লদের।'

যারা এল, ভালো, যারা না এল তাদের বাড়ি গিয়ে-গিয়ে বোঝাপড়া করতে লাগলেন গৌরীমা।

'কে বলছ মায়ের কাছে এলে সন্তানর জাত যাবে?' গর্জন করে উঠলেন গৌরীমা: 'যে বলছ সে তার নিজের ধর্মের কাছেই অপরাধী হচ্ছ। ইনি কি সামান্য নারী? ইনি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, ইনিই মহেশ্বরের আদ্যাশক্তি। নিজের দেশের লোক বলে এঁকে তোমরা চিনতে পাচ্ছ না, ইনিই ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, প্রাণশক্তি। ইনিই জীবন্ত দুর্গা। বিশ্বগা, অনন্তা, অব্যয়া, অন্তর্যামিনী মায়াশক্তি। ইনি ঈশ্বরের মাতৃরূপ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। রাজেন্দ্রাণী হয়ে কাঙালিনী সেজেছেন। যা করছেন তোমাদের মঙ্গলের জন্য, তোমাদের সমাজের মঙ্গলের জন্য করছেন। তাঁকে দেখ, তাঁকে চেন, তাঁতে শরণ নাও। তোমাদের ভববন্ধের কারণ যে অজ্ঞান তা ইনি নাশ করবেন।'

ধীরে ধীরে সকলের চোখ খুলতে লাগল। সবে যেতে লাগল কুয়াশা। মা-ঠাকরুন বললেন, 'গৌরী যে ঠাকুরের কথায় এ দেশ ভাসিয়ে দিলে!'

আমার সঙ্গে সকলে স্তব করো মা'র।

বলো, হে দেবি, পরমেশ্বরী, করুণাময়ী, করুণাসারে, আমার মুর্খতা হবণ করো। হে প্রতিভাপ্রীতিদায়িকে, আমার অন্তরে ব্রহ্মবিদ্যা বিকশিত করো। হে ধনাগমে, আমার দারিদ্র্য দূর করো, আমাকে শ্রীসম্পন্ন করো। আমার যোগক্ষেম বহন করো। সভামধ্যে জয়ী করো আমাকে, চীরজীবিত্ব মোক্ষ দাও। তুমিই কালী তুমিই তারা,

তুমিই ছিন্নমস্তা, তুমিই কুলকুণ্ডলিনী। তুমি এক সচ্চিদানন্দরূপিণী। তুমি দুই—ব্রহ্ম আর মায়া। তুমি তিন—ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী। তুমিই কোটিধা অনন্তরূপিণী, তুমিই কালিকা নামে প্রগীতা। শম্ভু পঞ্চমুখেও তোমার গুণকীর্তন করতে পারেন নি, চাপল্যবশে আমি যে স্তব করলাম তা তুমি ক্ষমা করো।

আর কী বলছেন বিবেকানন্দ?

'মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারোনি, এখন কেউ পারছে না, ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? সেখানে শক্তির অবমাননা বলে। মা-ঠাকরুন ভারতে আবার সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ীর আবির্ভাব হবে। দেখছ কী ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। তাই প্রথমেই তাঁর মঠ চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ। শক্তির কৃপা না হলে কী ছাই হবে! আমেরিকায় ইউরোপে কী দেখছি? শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধ ভাবে সাত্ত্বিক ভাবে মাতৃপূজা করবে, তাদের কি কল্যাণ না হবে? আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, সব বুঝতে পারছি দিন-দিন। সেই জন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা। বুঝতে পারছ?'

গৌরীমারও এই মায়ের মেয়েদের জন্যে আশ্রমস্থাপনের স্বপ্ন। আর যা স্বপ্ন তাই সঙ্কল্পের বিষয়ীভূত।

'ঐ মেয়েদের মঠে গৌরমাকে এক বছর মোহান্ত করবে।' লিখছেন স্বামীজি, 'সমস্ত খরচ আমি পাঠিয়ে দেব।'
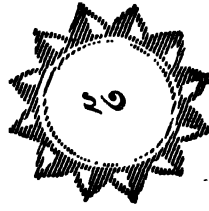
মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গৌরীমা চললেন কলকাতা।

যে ঠাকুর সেই মা।

এক ভক্ত মাকে প্রণাম করলে। ঠাকুরের প্রসাদ ঠোঙায় সাজালেন মা। সাজিয়ে তা জিহ্বাগ্র দিয়ে স্পর্শ করে দিলেন তার হাতে। ভক্ত বুঝি একটু কুণ্ঠিত হল। বললে, 'মা, আমি যে ঠাকুরের প্রসাদ ছাড়া খাই না।'

মা হাসলেন। বললেন, 'তবে খেও না।'

চলে যাচ্ছিল ভক্ত, কী হল কে জানে, ফিরল। 'মা, বুঝেছি।'

'কী বুঝেছ?

'বুঝেছি ঠাকুরও যা আপনিও তাই। অভিন্ন।'

মা আবার হাসলেন। বললেন, 'তবে খাও।'

আরেকজন ভক্ত মাকে প্রশ্ন করল: 'মা, ঠাকুর কি সদাসর্বদা আপনাকে দেখা দেন? আপনার হাতে খান এখনো?'

মা বললেন, 'আমরা কি আলাদা?' বলেই জিভ কাটলেন: 'কী বলে ফেললুম!'

কলকাতায় ফিরে গৌরীমা বলরাম বসুর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। কদিন পরেই কলেরা হল।

খবর গেল গিরিবালার কাছে। সকলে ছুটে এলেন। ঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানেরাও ছুটে এল। রোগ কঠিন থেকে কঠিনতর হল।

'আমাদের একটা গৌরমা ছিল তাও বুঝি বাঁচে না।' কেঁদে উঠল ব্রহ্মানন্দ।

কিন্তু এখনো কত কাজ বাকি, এখনো কত পরীক্ষা, এখুনি চলে গেলে চলবে কেন? চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার গুণে আরোগ্যের পথ ধরলেন গৌরীমা।

গিরিবালা বললেন, 'চল আমার সঙ্গে ভবানীপুরে।'

দুর্বল শরীরে আপত্তি টিকলনা, গৌরীমা বাপের বাড়ি চলে এলেন।

আবার সেই সতর্ক পাহারা। সেই সুতীক্ষ্ণ মনোযোগ। বন্ধন-বেষ্টনের মধ্যে পড়ে প্রাণ যায় গৌরীমার। ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তারদাত্রী---মাগো, বন্ধন মোচন করে দাও।

অবিনাশের ছেলে, ছোট ভাইপোর সাহায্য নিতে চাইলেন। বললেন, 'শোন, একটা কাজ করবি?'

'কি?'

'দুপুরবেলা, তো'র বাবা যখন বাড়ি থাকবেনা, আর, আর সকলে যখন এদিক-সেদিক রয়েছে, চুপি চুপি একটা ঘোড়ার গাড়ি এনে দিতে পারবি?'

'কেন, ঘোড়ার গাড়ি দিয়ে কী হবে?' দুষ্টু ছেলে চোখ নাচাল।

'আমি এক জায়গায় যাব।'

'তুমি এখনো ভালো করে সারোনি, তুমি যাবে কি?'

'না রে, সেরেছি, গায়ে বেশ জোর হয়েছে। গাড়ি চড়ে ঠিক যেতে পারব।'

'বাবা জানতে পারলে মেরে আমার হাড় গুঁড়িয়ে দেবে।'

'জানবে কী করে যে তুই গাড়ি ডেকে দিয়েছিলি?'

'ও ঠিক বুঝতে পারবে।'

'শোন, তোকে পাঁচটা টাকা দেব। লক্ষ্মীটি, একটা গাড়ি ডেকে আন। আমার ভীষণ দরকার!'

'পাঁচ টাকা দেবে?' বালক চঞ্চল হল সর্বাঙ্গে।

'দেব।'

বালক তখুনি ছুট দিল। একটা গাড়ি ডাকল, বাড়ির থেকে খানিক দূরে দাঁড় করাল। বালকই খবর দিল, সবাই এখন অমনস্ক, বেরুবার এই প্রশস্ত সময়। গৌরীমা গাড়িতে গিয়ে উঠলেন, তাড়াতাড়িতে ভুলে গেলেন টাকার কথা।

সোজা ট্রেন ধরলেন। চলো দক্ষিণাপথে। যে পথে গিয়েছেন আমার গৌরহরি। গৌরাঙ্গসুন্দর।

প্রথমেই শ্রীক্ষেত্র। নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ, প্রয়াগে মাধব, মন্দারে মধুসূদন। আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ আর জনার্দন। বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু, মায়াপুরে বা হরিদ্বারে হরি।

শ্রীক্ষেত্রেই সার্বভৌমমোচন। সার্বভৌম সঙ্কল্প করলেন বেদান্ত পড়িয়ে তরুণ সন্ন্যাসীকে অদ্বৈতমার্গে নিয়ে আসবেন। সাত দিন পর্যন্ত পড়ালেন বেদান্ত। সন্ন্যাসী হাঁ-ও বলে না না-ও বলে না, চুপ করে কেবল শোনে। 'তোমার মনের ভাব তো কিছুই বুঝছি না, প্রতিবাদও কর না, সম্মতিও দাও না- বিষয়টা বুঝতে পারছ কিনা তাই বা বুঝি কী করে?'

মহাপ্রভু বললেন, 'তুমি বেদান্তের সূত্র যা পড়ছ তা বেশ বুঝছি কিন্তু তোমার ভাষ্যই দুর্বোধ। মনে হচ্ছে তোমার ব্যাখ্যা বেদান্ত-সূত্রের অর্থকে প্রকাশিত না করে বরং আচ্ছাদিত করছে।'

শুনে সার্বভৌম তো স্তম্ভিত। বেশ, বিচার করো। সার্বভৌম অনেক বিতর্ক তুললেন। সমস্ত খণ্ডন করে দিলেন প্রভু। মায়াবাদ থেকে ভক্তিবাদের দিকে টেনে আনলেন সার্বভৌমকে। দেখালেন ষড়ভুজ মূর্তি। সর্বভৌমের সমস্ত বিদ্যাগর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

'জগৎ নিস্তারিলে তুমি—সেই অল্পকার্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি—এ শক্তি আশ্চর্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি—যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ-প্রচণ্ড॥'

গৌরীমা তারপর গেলেন সীমাচলম। পাহাড়ের শিখরে দেখলেন নৃসিংহদেবের মন্দির, দেখলেন প্রহ্লাদপুরী।

'এতকাল গুরুগৃহে থেকে যা শিখলে তার সারবস্তু কী, কিঞ্চিৎ বলো।' প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে জিগগেস করল হিরণ্যকশিপু।

প্রহ্লাদ বললে, 'বাবা, শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য আর আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণা ভক্তিই সার শিক্ষা।'

'এ কী কলঙ্ককথা!' গুরুপুত্রের দিকে তাকাল হিরণ্যকশিপু: 'আমার ছেলেকে এই সব অসার বিষয় শিখিয়েছ?'

গুরুপুত্র বললে, 'আপনার ছেলে যা বললে এ আমি তাকে শেখাইনি, আর কেউও শেখায়নি। এ স্বভাববুদ্ধিতে এ সব বলছে।'

ছেলেকে লক্ষ্য করল হিরণ্যকশিপু: 'এই অসদবুদ্ধি তুই কোত্থেকে পেলি? গুরুর উপদেশ থেকে নয়তো কিসের থেকে?'

'গুরুও বিষয়াসক্ত, গৃহস্থও বিষয়াসক্ত। অন্ধনীয়মান অন্ধের মত গৃহস্থেরা শ্রীকৃষ্ণকে কী করে জানবে গুরুর উপদেশ থেকে? যাদের অন্তঃকরণ বিষয়বিমুগ্ধ তারা জানতে পারে না কৃষ্ণকে। যাদের আত্মাতে পুরুষার্থবুদ্ধি, ভগবান শুধু তাদেরই প্রাপ্য। যে পর্যন্ত অনভিমানী সাধুদের পদধূলিতে না অভিষিক্ত হচ্ছে সে পর্যন্ত ভগবানের পাদস্পর্শ অসম্ভব। সে পাদস্পর্শ না পাওয়া পর্যন্ত সংসার-নাশ হবে না। অশান্তেন্দ্রিয় গৃহস্থরা বারেবারে সংসারে প্রবেশ করে শুধু চর্বিতচর্বণ করে যাবে।'

কোল থেকে ছেলেকে ভূতলে নিক্ষেপ করল হিরণ্যকশিপু। আরক্তলোচনে বললে, 'এই অধমকে এখুনি বধ করো।'

কত শত অকল্পনীয় অত্যাচার হল প্রহ্লাদের উপর—মর্মস্থানে শূলাঘাত, সর্পদংশন, শৈলশৃঙ্গ হতে নিক্ষেপ, বিষভোজন—কী নয়! প্রহ্লাদের চিত্ত ঈশ্বরসংলগ্ন ছিল বলে সমস্ত প্রহার, অপুণ্য ব্যক্তির সৎকর্মোদ্যমের মত ব্যর্থ হয়ে গেল। যার চিত্ত ঈশ্বরে নিবিষ্ট বিষয়ান্তর তাকে স্পর্শ করে কী করে?

আরেক পর্বতশিখরে 'পানা-নরসিংহজী' দেখলেন গৌরীমা। এই বিগ্রহ সর্বদা পানানন্দে বিভোর, তাই এর এই বিচিত্র নাম।

সেখান থেকে গৌরীমা গেলেন রাজমহেন্দ্রীতে। এরই সন্নিকটে বিদ্যানগর, যেখানে রায় রামানন্দের বাসা। গোদাবরীর তীরে, গৌরীমা যেন দেখতে পেলেন, রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু আজও কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব—সাধ্যসাধনতত্ত্ব আলোচনা করছেন, সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম তাই শুনছে।

'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার।'

লক্ষ্মীর প্রেমে নারায়ণের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি, তাই তা সসঙ্কোচ। গোপীকার প্রেমে কৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি নেই, তাই তা বিশুদ্ধ, অসঙ্কোচ। নারায়ণে লক্ষ্মীর তদীয়তাবুদ্ধি। কৃষ্ণে গোপীকার মদীয়তাবুদ্ধি। বহু সেবিকার মধ্যে আমিও একজন—লক্ষ্মীর এই বুদ্ধি, এই বুদ্ধিতে প্রীতি দুর্বল। আর কৃষ্ণ একলা আমারই—এই অনুভবে গোপীকার প্রেম দুর্ধর্ষ। লক্ষ্মী নারায়ণের অপেক্ষা করে, গোপীকা কৃষ্ণের অপেক্ষা করে না, বরং কৃষ্ণই তার জন্যে অপেক্ষমান।

জগদেকমনোহরা শ্রীরাসলীলার জয় হোক, যে রাসলীলায় লক্ষ্মীদেবীর চেয়ে ব্রজদেবীর মহিমা অধিকতর প্রস্ফুট।

যদিও সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তাপ্রেম তিনই উত্তম, কান্তাপ্রেম, 'সাধ্যাবধি'। কেন? মহাপ্রভু বললেন, 'পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।'

শান্তরসের দুই গুণ, কৃষ্ণনিষ্ঠা ও কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ। দাস্যরসে

এ দুই গুণ তো আছেই, আরো আছে সেবানিষ্ঠা, যা শান্তরসে নেই। সখ্যরসে দাস্যের তিন গুণ তো আছেই, আছে একটি চতুর্থ গুণ—অভিন্ন-মননে অসঙ্কোচ সেবা, যা দাস্যে নেই। বাৎসল্যরসে সখ্যের চার গুণ তো আছেই, আছে একটি পঞ্চম গুণ—মমতাধিক্যে তাড়ন-তর্জন, যা সখ্যে নেই। কান্তারতিতে বাৎসল্যের পাঁচ গুণ তো আছেই, আছে একটি ষষ্ঠ গুণ—নিজাঙ্গদানে কৃষ্ণসেবা, যা বাৎসল্যে নেই। সুতরাং কান্তাপ্রেমই সাধ্যের অবধি।

গৌরীমা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। দলবল জুটিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নামকীর্তনে—গৌরাঙ্গগুণগানে। প্রবেশ করলেন বিদ্যানগরে, যার আকাশে বাতাসে গৌরনাম লেখা। 'ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ!' সেই রঙ্গসঙ্গিনীই গৌরীমা।

সেখান থেকে গেলেন মাদুরায়, যার আরেক নাম দক্ষিণ-মথুরাপুরী। দেখলেন মীনাক্ষীকে।

এই দক্ষিণ মথুরাপুরীতেই রামভক্ত বিপ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মহাপ্রভুর। উপবাস করে আছে বিপ্র, রান্নার আয়োজন নেই। লক্ষ্মণ বন্য ফল-শাক আনতে গিয়েছে, ফিরে এলে পর সীতাদেবী রান্না করবেন—তারই অপেক্ষায় বসে আছে। এই তার সাধনা। অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে লীলাস্মরণ।

মাদুরা থেকে চলে আসছেন গৌরীমা, শুনতে পেলেন, হঠাৎ কে তাঁকে মধুর কণ্ঠে সম্বোধন করে বলছে, 'আমি এইখানে আছি, তুই আমাকে দেখে যা।'

কে? কোথায়? কতদূরে?

পথের পর পথ, এগিয়ে চললেন গৌরীমা। বারো মাইল হাঁটলেন একটানা।

কোথায় তুমি কৃষ্ণ নবজলধর? সর্বচিত্তাকর্ষক কোথায় তুমি?

একমাত্র প্রেমদাতা, রসময়, রসের সদন! অনন্তরূপে একরূপ। সর্বসেব্য সর্বোত্তম, তুমি কোথায়?

আলগর-কয়েলে এসে থামলেন গৌরীমা। দেখলেন আলগরজীকে। স্বহস্তে লুচি-মালপো করে ভোগ দিলেন। বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন ইনিই ডেকেছিলেন অন্তরঙ্গ হয়ে। ইনিই নিয়ে এসেছেন পথ দেখিয়ে।

সেখান থেকে এলেন শ্রীরঙ্গে। এইখানেই মহাপ্রভু চাতুর্মাস্য করেছিলেন। দেখেছিলেন সেই ব্রাহ্মণকে, যে গীতার অশুদ্ধ পাঠ করেও অর্জুনের রথে শ্যামলসুন্দর রজ্জুধর কৃষ্ণ দর্শন করছে। যাকে মহাপ্রভু গীতাপাঠের পূর্ণতম অধিকারী বলে ঘোষণা করেছিলেন। 'যাবৎ পড়ি তাবৎ দেখি।' প্রভু বলেছিলেন, তুমি গীতার সার অর্থ উপলব্ধি করেছ।

সেখান থেকে গেলেন পক্ষীতীর্থে। মন্দিরে কোনো বিগ্রহ নেই, কিন্তু পূজার শেষে ভোগ নিবেদন করবার অব্যবহিত পরেই কোত্থেকে উড়ে আসে দুই শ্বেতপক্ষী, সেই ভোগ খেয়ে যায়। ভক্তদের বিশ্বাস ঐ দুই পাখি হরগৌরী, প্রত্যহ কৈলাস থেকে আসে পূজা নিতে। গৌরীমার দেওয়া পূজা আর ভোগও তারা গ্রহণ করল। হরপার্বতীর উদ্দেশে প্রণাম করলেন গৌরীমা। নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।

## ২৪
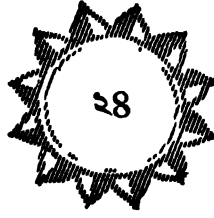
তারপর শিবকাঞ্চী হয়ে এলেন বিষ্ণুকাঞ্চীতে।

বিষ্ণুকাঞ্চীতে নারায়ণ চতুর্ভুজ মূর্তিতে বিরাজমান। কিন্তু গৌরীমা দেখলেন, দ্বিভুজরূপে দাঁড়িয়ে আছেন মুরলীধারী।

নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাসরূপ। দ্বিভুজ বিগ্রহই কৃষ্ণের স্বরূপবিগ্রহ। সেই দ্বিভুজ স্বরূপবিগ্রহই পরব্যোমে নারায়ণরূপে চতুর্ভুজ হন। কিন্তু আসলে উভয়ে অভিন্ন।

'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥'

কৃষ্ণের অনাদিসিদ্ধ নিজস্বরূপই নরাকৃতি। কৃষ্ণের অঙ্গসন্নিবেশকে আদর্শ করেই মানুষের অঙ্গসন্নিবেশ করা হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণের 'কিশোরে নিয়তস্থিতি'। পরিহাস করে যখন চতুর্ভুজ নারায়ণের রূপ ধরে কুঞ্জে বসেছিলেন তখন গোপীদের প্রেম সঙ্কুচিত হয়েছিল। নটবরবেশের পরিবর্তে যখন কুরুক্ষেত্রে রাজবেশ ধরেছিলেন তখনও গোপীদের প্রেমস্ফূর্তি হয়নি। তারা সেই গোপবেশ বেণুকরকেই চেয়েছিল দেখতে।

গৌরীমাও দেখলেন সেই মনোমত মনোমোহনকে।

আরো বহু তীর্থ পরিক্রম করে শেষ পর্যন্ত পৌছলেন রামেশ্বরে।

মনে আকাঙ্ক্ষা, গঙ্গোত্রী থেকে যে পুণ্যজল নিয়ে এসেছেন তাই দিয়ে স্নান করাবেন দেবতাকে। কিন্তু যে প্রকোষ্ঠে রামেশ্বর আছেন সেখানে প্রবেশ নিষেধ। নাটমন্দির থেকে দর্শন করো। আমার তো শুধু দর্শন নয়, স্পর্শনের অভিলাষ। আশুতোষ শিব কি কন্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন না ?

এই রামেশ্বরকে দেখে শ্রীশ্রীমা বলে উঠেছিলেন, 'যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমনটিই আছে।'

কাছে ভক্ত যারা ছিল সবিস্ময়ে বলে উঠল : 'মা, এ কী বললে ?'

মা আত্মসংবরণ করলেন। বললেন, 'ও একটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

রামেশ্বর বালুকানির্মিত শিব। লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফিরে যাবার পথে এই শিব প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেছিলেন সীতা। মা বুঝি সেই পূর্বকথাই বলছেন। ত্রেতায় যে সীতা কলিতে সেই সারদা। রামময়জীবিতা এখন রামকৃষ্ণময়জীবিতা।

কলকাতায় ফিরে এলে কোয়ালপাড়ার কেদারবাবু মা ঠাকরুনকে জিগগেস করলেন, 'রামেশ্বর কেমন দেখলেন ?'

অন্যমনস্কের মত মা আবার বলে ফেললেন, 'বাবা যেমনটি রেখে এসেছিলুম ঠিক তেমনটিই আছেন।'

পাশের বারান্দা থেকে শুনতে পেয়েছেন গোলাপ-মা। কথাটা কানে যাওয়ামাত্রই চেপে ধরলেন মাকে, 'কী বললে মা ?'

'কই কী বললাম ?' কথাটা মা ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন।

নাটমন্দিরে দামোদরকে স্থাপন করে পুজো করলেন গৌরীমা। একান্তচিত্তে পাঠ করলেন শিবস্তোত্র। কী গম্ভীর অথচ কী বিশুদ্ধ উচ্চারণ !

'কৈলাস-শৈল-বিনিবাস বৃষাকপে হে
মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ
সংসার-দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥
বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশ্রয় বিশ্বরূপ
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাধিবাস
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো।
সংসার-দুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥'

তাঁর স্তোত্রপাঠ শুনে পুজারিরা মুগ্ধ হয়ে গেল। এ তো সাধারণ সন্ন্যাসিনী নয়, এ দিব্যভাবদীপ্তা সাকারশক্তি। এ যে গায়ত্রী সাবিত্রী সরস্বতী।

'মা, বিগ্রহের স্নানপূজা করবে?' জিগগেস করল পুজারিরা।

'দেবে করতে?'

'তোমাকে কে রোধ করবে? তুমি যে মহেশের মেয়ে।'

গঙ্গোত্রীর পুণ্যবারিতে রামেশ্বরকে স্নান করালেন গৌরীমা।

'জলে স্থলে চান্তরীক্ষে বিদেশে শত্রুসঙ্কটে।
বনমধ্যে রণমধ্যে সভামধ্যে তথৈব চ ॥
রাজদ্বারে মহারোগে মহাশোকে মহাভয়ে।
সর্বত্রৈবাশুভং হন্তি স্তবপাঠপ্রসাদতঃ ॥'

এ কে বিদ্যুদগৌরী সুবর্ণাঙ্গী? এত শাস্ত্র ও সংস্কৃত এ শিখল কোত্থেকে? পণ্ডিতেরা পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে গৌরীমার স্তোত্রপাঠ শোনে, শোনে ভাগবত ব্যাখ্যা—আর ধ্বনিতে বাণীতে ব্যাখ্যায় প্রতিভায় বিহ্বল হয়ে যায়। স্ত্রীলোক দূরের কথা, সচরাচর কোনো পণ্ডিতের মুখেও এমন উদার উচ্চারণ এমন প্রসন্ন ব্যাখ্যা কেউ শোনেনি। কে এ পীযূষবাদিনী! কে এ শিবভাবিতা, গোবিন্দ-হৃদয়ঙ্গমা! ব্রহ্মজ্ঞানবিনোদিনী!

কন্যাকুমারীতে এলেন গৌরীমা। 'কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণী নমস্তুতে।'

মন্দিরে নিত্য চণ্ডীপাঠ করছেন আর যে শুনছে সে দিব্যরোমাঞ্চে ঝংকৃত হচ্ছে।

'কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।' কৌমারী—অসুরবিজয়িনী কার্তিকেয়শক্তি। সে শক্তির বাহন ময়ূর, সর্পভোজী বিহঙ্গম। সর্প কী? কুটিলগামিনী ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি। যে শক্তি সে অসুরবৃত্তিকে দমন করে দেবভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে তাকে প্রণাম। আর কৌমারীশক্তি অনঘা, তার দর্শনেই জীব পাপমুক্ত। নিরঞ্জনস্বরূপিণীকে প্রণাম।

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা।
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেত
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

মা, তুমিই বৈষ্ণবীশক্তি। সর্বব্যাপিনী জগৎপালিনী স্থিতিশক্তি। তোমার অসীম বীর্যবৈভব। তুমি বিশ্ববীজ, সৃষ্টিপ্রপঞ্চের আদি কারণ। তুমি আবার মহীয়সী মায়া। তুমি এক মূর্তিতে ভোগবতী অন্য মূর্তিতে মোক্ষদায়িনী। হে সম্মোহিনী, তুমি প্রসন্না হও। তুমি প্রসন্ন হলেই তোমার মোহিনীমূর্তি অপসৃত হবে। হে পরমপ্রকৃতি, তখন তোমাকে চিনব জননীরূপে, আমাকে তুমি বুকে তুলে নিয়ে যাবে মুক্তি-মন্দিরে।

হ্যাঁ, প্রার্থনা করো। প্রার্থনা ভিক্ষা নয়, প্রার্থনাই যথার্থ সাধনা। প্রার্থনায় জগতের সৃষ্টি, প্রার্থনায় জগতের অবস্থিতি, প্রার্থনায় জগতের ব্রহ্মবিলয়। প্রকৃষ্টরূপ অর্থনাই প্রার্থনা। প্রকৃষ্টরূপ অর্থনা করতে পারলেই সর্বকামনায় সিদ্ধি। কে অর্থনা করবে? যে ঈশ্বরসত্তায় ঈশ্বরশক্তিমত্তায় বিশ্বাসী সেই প্রার্থনা করতে সমর্থ।

বালাজী গোবিন্দের মন্দিরে এসে উঠলেন গৌরীমা। ছ-ছটা

পাহাড় ডিঙিয়ে সপ্তম পাহাড়ের শিখরে সেই মন্দির। দুর্গম, দুরারোহ—তবু গৌরীমা থামলেন না, উঠলেন শেষ পর্যন্ত। যা ভয় তাই জয়। যা মনে হচ্ছে বন্ধন তাই শেষে বন্ধন-মোচনের উপায়।

আর বুঝি কিছু আবেদন-নিবেদন করতে হয় না গৌরীমাকে। সবাই যেন আপনা থেকেই অনুভব করতে পারে এ এক মূর্তিমতী বিভা, মূর্তিমতী বিদ্যা—সৌম্যা, পূজনীয়া।

গৌরীমা স্বহস্তে রেঁধে বালাজী গোবিন্দকে ভোগ দিলেন।

এ যেন শুধু ভোজ্য খেতে দেওয়া নয়, অন্তরের অনবচ্ছিন্ন মধুধারায় তৃপ্ত করা।

মা-ঠাকরুন বললেন, 'দুপুরের আগেই জপ সারবে, তা নইলে উপবাসী রাখা হয় ইষ্টকে। ইষ্টকে উপবাসী রাখতে নেই। এই জপই তাঁর ভোজ্য।

মন স্থির করে দশবার জপ করলে লক্ষ জপের কাজ হবে। রাত্রে বিছানায় শুয়েও ধ্যান করবে, জপ করবে।

খুব জপ করবে। সংসারে কাজের শেষ নেই। কাজ করতে-করতে জপ করবে। জপাৎ সিদ্ধি। জপেই সচ্চিদানন্দের সমুদ্রে অবগাহন। জপেই অবলোকন।'

'কৃষ্ণাবলোকন বিনা নাহি কিছু আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান॥'

ত্রিবান্দ্রমে গিয়ে গৌরীমা দেখলেন পদ্মনাভকে। জগন্নাথকে দেখলেন ভরকালায়। আর গৌরগৌরবোজ্জ্বল সমস্ত অস্তিত্ব স্তবময় হয়ে উঠল : জয় জয় নারায়ণ গোপাল হরে। আর্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান নারায়ণো মে গতিঃ।

২৫
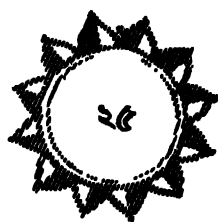
শক্তি থেকে ভক্তি, আবার ভক্তি থেকে শক্তি। 'সব্য হস্তে মুক্ত খড়গ দক্ষিণে অভয়।' একদিকে মৃড়ানী রুদ্রাণী, আরেক দিকে গৌরদাসী, হ্লাদিনী মূর্তিমতী। এক হাতে শক্তি আরেক হাতে ভক্তি। এক হাতে পাশ আরেক হাতে বনমালা।

শ্রীরামকৃষ্ণের দুই মানসসন্তান। একদিকে স্বামী বিবেকানন্দ, আরেক দিকে সন্ন্যাসিনী গৌরদাসী। দুইই অভয়মন্ত্রের উদ্গাতা। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। দুইয়েরই বলসাধনা, দুইই দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী। ভয়ের হেতু কী ? অজর ও অমর আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞান। দেহাত্মবোধই সকল পাপ ও দুঃখের হেতু। দুইই আত্মা· . অবস্থিত। সর্বভূতাত্মভূতাত্মা। আর সেই কারণে দুইই সর্বভূতহিতে রতাঃ।

ব্যক্তিত্বে বাগ্মিতায় দুইই উদ্দীপ্ত। আবার ভক্তিতে প্রেমে দুইই দ্রবীভূত।

একদিকে যেমন গৌরীমা বেরিয়েছেন তেমনি স্বামীজিও বেরিয়েছেন—একই দক্ষিণাপথে।

গৌরীমা শুনছেন : 'এই কদিন আগে এখানে রাজপুত্রের মত এক বাঙালি সাধু এসেছিলেন, যেমন প· ণ্ডিত তেমনি বাগ্মী। চেন তাকে ?'

আবার স্বামীজি শুনছেন : 'এই সেদিন এখানে এক বাঙালি সাধুমায়ী এসেছিলেন, কী তেজ কী ভক্তি, চেন তাকে ?'

পরস্পর পরস্পরকে চিনল।

'তোমাদের দেশের ভক্ত-মেয়ে এমন জ্যোতির্ময়ী হয়?'

'উনি আমাদের গৌর মা।' শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় কৃপাসিদ্ধ ব্রজগোপী।'

আমেরিকা থেকে লিখছেন স্বামীজি: 'গৌর মা কোথা? এক হাজার গৌর মা চাই। ত্যাগোদ্দীপ্তা তেজস্বিনী তপস্বিনী।'

বেলুড়মঠের প্রথম দুর্গোৎসবে মা-ঠাকরুন উপস্থিত হলেন। মায়ের নামেই সঙ্কল্প হল। স্বামীজি বললেন, 'আমরা তো কোপনিধারী, আমাদের নামে হবে না।'

গৌরীমাকে বললেন, 'কুমারী পূজার ব্যবস্থা করো।'

নটি অল্পবয়স্কা কুমারীকে নির্বাচন করা হল। পাদ্য-অর্ঘ্য শঙ্খবলয়-বস্ত্র দিয়ে তাদের পূজা করলেন স্বামীজি। চরণে অঞ্জলি দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। হে মূর্তিমতী পবিত্রতা, আমাদের যত কিছু পাপ আর মলিনতা হরণ করো। 'হর পাপং হর ক্ষোভং হরাশুভং।' নাও আমাদের পাপ-তাপ আধি-ব্যাধি, অনাদি জন্মসঞ্চিত বাসনা-সংস্কার। তুমি দেবগণের তেজোরাশিসমুদ্ভবা, পরিত্রাণ-পরায়ণা মূর্তিতে আবির্ভূত হও।

ভাবাবিষ্ট স্বামীজি একটি কুমারীর কপালে রক্তচন্দন এঁকে দেবার সময় সামান্য একটু খোঁচা দিয়ে ফেললেন বোধহয়। অমনি ব্যথায় শিউরে উঠলেন: 'আহা, দেবীর তৃতীয় নয়নে আঘাত লাগেনি তো!'

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম॥

যিনি স্বয়ং সুকৃতিশালী জনগণের ভবনে শ্রী, পাপাত্মাদের ভবনে অলক্ষ্মী, বিবেকীদের হৃদয়ে বুদ্ধি, সজ্জনদের অন্তরে শ্রদ্ধা, সৎকুল-

সম্ভূত জনগণের হৃদয়ে লজ্জারূপে বিরাজমানা, সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করি। হে দেবি, তুমিই বিশ্বকে পরিপালন কর।

দক্ষিণাপথে কোনো এক তীর্থে গৌরীমা শুনতে পেলেন এক মোহান্ত অন্যায় অভিসন্ধিতে তার ঘরে এক অনাথা মেয়েকে আটক করেছে।

এই কথা? গৌরীমা কোমর বাঁধলেন। ঐ বন্দিনীকে উদ্ধার করতেই হবে।

'অনেক হাঙ্গামা মা।' কেউ-কেউ নিরস্ত করতে চাইল: 'এখানে মোহান্তের অনেক দলবল, অনেক প্রতিপত্তি—তুমি এঁটে উঠবে না।'

'একশোবার এঁটে উঠব।' সঙ্কল্পে সুদৃঢ় গৌরীমা: 'যা ন্যায় যা ধর্ম তার জন্যে লড়ব। হাঙ্গামাকে কি আমি ভয় করি?'

'কে না কে কোথাকার এক গ্রাম্য মেয়ে '

'অমন করে বোলো না। সতীশক্তি মাতৃশক্তি বিপন্ন। তোমরা সবাই এস আমার সঙ্গে, আমরা এই পাপের উচ্ছেদ করব।'

রাজকর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করলেন গৌরীমা।

তারা প্রথমে গা করতে চাইল না। কিন্তু সাধ্য কী এই সত্যব্রতধারিণী তেজস্বিনীকে উপেক্ষা করে।

এই অন্যায়ের প্রতিকার চাই। আপনারা দেখুন অনুসন্ধান করে। মোহান্ত যদি প্রবল, রাজশক্তি প্রবলতর।

বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনলেন গৌরীমা। দুর্বৃত্ত মোহান্তের শাস্তি হল।

'জানেন এক বাঙালি মাতাজি এখানে এক অঘটন ঘটিয়েছে। পাপাত্মা মোহান্তকে জেলে পাঠিয়েছে।'

বাঙালি মাতাজি!

স্বামীজি অনায়াসে বুঝতে পারলেন ইনি গৌর মা ছাড়া

আর কেউ নন। যাকে তিনি সর্বজয়া ঠাকুরাণী বলেন এ তাঁরই কীর্তি।

শুধু দৈহিক বল নয়। তিনি আত্মিক বলে বলীয়সী।

গয়াধামে এসেছেন গৌরীমা। শুনতে পেলেন পাণ্ডারা কতগুলো যাত্রীকে আটক করেছে। কী অপরাধ? তারা যথাতিরিক্ত দেয়নি পাণ্ডাদের। পাণ্ডাদের সমস্ত প্রাপ্য মিটিয়ে দিক, তবে ছেড়ে দেব।

যাত্রীদের মধ্যে অসহায় কতগুলো মেয়ে।

খবর পেয়ে গৌরীমা গেলেন পাণ্ডাদের কাছে। যেন তিনি পাণ্ডাদের হয়ে তাদের প্রাপ্য আদায় করে দেবেন এমনি মনে হল পাণ্ডাদের।

'মাতাজি, আপনি তো আমাদের লোক, প্রাপ্য ছাড়লে আমাদের চলে কী করে?'

গৌরীমাকে মেয়েদের ঘরে পাঠিয়ে দিল পাণ্ডারা।

মেয়েরা বললে তখন তাদের দুঃখের ইতিহাস। পাণ্ডাদের অকথ্য জুলুমবাজি।

'আমি সব বুঝেছি।' বললেন গৌরীমা, 'আমি এসেছি তোমাদের আশ্বাস দিতে। বলতে, যেন ভয় না পাও। গদাধর তোমাদের রক্ষে করবেন।'

'কিন্তু মা, আপনি কে?' মেয়ের দল চঞ্চল হয়ে উঠল: 'আপনি কী করে বাঁচাবেন আমাদের? আপনাকেও যদি আটক করে রাখে?'

'আমাকে কে আটক করবে? সঙ্গে আমার ঠাকুর আছে না?'

'ঠাকুর?'

'হ্যাঁ, আমার সেথো। আমার সেথো-ঠাকুর। তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেন। আমার জন্যে ভেবো না। তোমাদের নিজেদের জন্যেও অস্থির হবার কারণ নেই।'

গয়ার দারোগা হরিহরবাবু গৌরীমার চেনা। সটান তার কাছে গিয়ে হাজির হলেন গৌরীমা।

'বাবা, বিপন্ন মায়েদের রক্ষা করো।'

সব শুনে দারোগাবাবু ছুটলেন সেপাই নিয়ে। জুলুম করবার আর জায়গা পাওনি। এই তোমাদের পয়সা আদায়ের জাঁতিকল?'

পাণ্ডারা মুক্ত করে দিল মেয়েদের। সকলের কাছ থেকে মার্জনা চেয়ে নিল।

'আমার সেথো ঠাকুরকে দেখবে?' গৌরীমা মেয়েদের বললেন হাসিমুখে, 'এই দেখ আমার পথিকবন্ধুকে।' গলায় বাঁধা দামোদর শিলা দেখালেন সকলকে।

রণে-বনে দুর্গমে-সুগমে সব সময়েই তিনি চলেছেন আমার সঙ্গে, আমার পায়ে-পায়ে নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে।

সেবার কলকাতা থেকে যাচ্ছেন জয়রামবাটি, সোজা পায়ে হেঁটে। পথঘাট বিঘ্নে কণ্টকে ভরা, তবু গ্রাহ্য নেই গৌরীমার। মার কাছে মেয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে আর ভাবনা কী।

কিন্তু জাহানাবাদের কাছে ডাকাতের দল পিছু নিল। ভালো-মানুষের ভাব ধরল, যেন তারাও এ পথের নিরীহ যাত্রী।

সঙ্গে টাকা পয়সা আছে, সব চেয়ে বড় কথা, ঠাকুরের কখানা অলঙ্কার আছে, তবু এতটুকু কুণ্ঠা বা আড়ষ্টতা নেই গৌরীমার।

'এস এই গাছতলায় বসি।'

'কেন মা?' ডাকাতেরা কৌতূহলী হল।

'আমার ঠাকুরের পুজো করব এখানে।'

'সে তো খুব ভালো কথা।' ডাকাতেরা ভক্তের ভাব ধরল: 'তা হলে তো ঠাকুরের ভোগ লাগাতে হয়। যদি বলো আশেপাশের গ্রাম থেকে ভোগের যোগাড় করি।'

'করবে? দেখ। ঠাকুরের যদি ইচ্ছে হয় খাবেন ভালোমন্দ।'

নানারকম খাদ্যদ্রব্য যোগাড় করে আনল ডাকাতেরা।

পূজা শেষে দামোদরকে ভোগ নিবেদন করতে যাবেন, দামোদর গৌরীমার কানে কানে বললে, 'ও আমি খেতে পারব না। আমি না খেলে তুমিও খাবে না।'

'কেন, খাবে না কেন?'

'খাবার জিনিসে ওরা বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।'

বলা নেই, কওয়া নেই, ডাকাতেরা হঠাৎ দেখল গৌরীমা আগুনের মত লেলিহান হয়ে উঠেছেন। ব্যক্ত করেছেন রোষনেত্র। বরদায়িনী সর্বনাশী প্রলয়মূর্তি ধরেছেন। ভোগ ঠাকুরকে নিবেদন না করে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে। বজ্রঘোষে বলে উঠলেন, 'তোরা এমন পাষণ্ড, তোরা ঠাকুরের ভোগের জিনিসে বিষ মিশিয়েছিস? তোদের কী হবে?'

ডাকাতের দল কাঁপতে লাগল।

এ কী হয়ে গেল্ল পলকে! মাতাজি কী করে জানলেন বিষের কথা! আর জানামাত্রই সে কোমলকায়া মা কী করে প্রলয়ঙ্করী করালমূর্তি প্রকটিত করলেন! এ মা শুধু সামান্য সন্ন্যাসিনী নয়, নিশ্চয়ই কোনো দেবী ছদ্মবেশিনী।

ভয় ধরল ডাকাতদের। গৌরীমার পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়ল।

'বল এ দুষ্কর্ম ছেড়ে দিবি।'

'দেব।'

'দিবি? কী করবি তবে?'

'চাষবাস করব।'

'তাই করগে যা। তাই করতে হবে তোদের।'

ডাকাতেরা কিছু রাস্তা এগিয়ে দিল গৌরীমাকে। গৌরীমা

বললেন, 'আর তোদের আসতে হবে না। তোরা এবার ফিরে যা। আমি একাই যেতে পারব।'

ফিরে গেল ডাকাতেরা।

কালীঘাটে কালী দর্শন করে যাচ্ছেন নকুলেশ্বর তলায়, হঠাৎ কটা মাতাল যুবক গৌরীমার পিছু নিল। সঙ্কীর্ণ গলিতে প্রায় গায়ের উপর এসে পড়তে গৌরীমা ফিরে দাঁড়ালেন, রুখে দাঁড়ালেন।

সে কী সুন্দরী সৌম্যতমা মূর্তি! প্রকোষ্ঠে শাঁখা, ললাটে সিন্দূর, পরনে লালপাড় গৈরিক, অগ্রে গ্রন্থি দেওয়া অজস্র কেশরাশি পিঠের উপর বিস্রস্ত, হাতে কমণ্ডলু, কে বলবে ইনি নন সেই জগদ্ধাত্রী বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু যিনি জগদ্ধাত্রী তিনিই আবার প্রচণ্ড-চণ্ডিকা। তিনিই আবার খড়িগনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।

'কে রে তোরা?' হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন গৌরীমা।

আর হুঙ্কারের সঙ্গে-সঙ্গেই মাতালের দল পড়ল ভূতলে। আর্তকণ্ঠে রব তুলল, 'মা, রক্ষা করো মা, রক্ষা করো।'

'বল আর কখনো মাতৃজাতির উপর হীন বুদ্ধি করবিনে—'

কী হল মাতালদের, তারা যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। বলতে লাগল, 'আর কখনো না, কখনো না—'

দুর্মতিদের এই পরিবর্তন—যারা এই ভোজবাজি দেখল তারাই অবাক হয়ে গেল।

হরীশের বেলায় মা-ঠাকরুনও ধরেছিলেন বগলামূর্তি।

হরীশ সাধুদের কাছে যাতায়াত করে, সেই ভয়ে তার স্ত্রী তাকে ওষুধ দেয় যাতে সে স্ত্রীর বশে থাকে। ফলে হরীশের মাথা গেল খারাপ হয়ে।

একদিন হল কী, মা-ঠাকরুন কামারপুকুরের বাড়িতে একা আছেন, খ্যাপা হরীশ তাঁর পিছু নিল। উঠোনের ধানের হামারের চারপাশে মা ঘুরতে লাগলেন, হরীশও পিছে পিছে ছুটতে লাগল—

প্রায় ধরো-ধরো অবস্থা। সাত-সাত বার ঘুরে মা নিরস্ত হলেন, ফিরে দাঁড়ালেন, রুখে দাঁড়ালেন, ধরলেন স্বমূর্তি। হরীশকে ধরে, পেড়ে ফেললেন মাটিতে। ওর বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসে ওর জিব টেনে ধরে প্রবল চড় মারতে লাগলেন। মারতে-মারতে হাতের আঙুল লাল করে ফেললেন। সে মারের ফলে হরিশের পাগলামি ছুটে গেল।

'মায়াবস্ত্রে কায়া ঢাকি, সতত গোপনে থাকি।' সমস্ত মেয়ের মধ্যেই আছে এই প্রচ্ছন্ন চিতিশক্তি—কল্যাণী শক্তির পাশেই করালী শক্তি—তারই উদ্বোধন চাই।

একদিকে পরমার্তিহন্ত্রী, অন্য দিকে দুর্বৃত্তবৃত্তশমনী। তুমি সর্বায়ুধধারিণী, আবার তুমি প্রসাদসুমুখী, দয়ার্দ্রচিত্তা।

শ্রী ধী হ্রী ও অভী—মাতৃশক্তির সম্যক অভিষেক হোক।

হালিসহরের কাছে গঙ্গাতীরে নির্জনে বসে চণ্ডীপাঠ করেন গৌরীমা আর নৌকো বাইতে বাইতে মাঝিরা বুঝি তাই দেখে। তারা কিছু বোঝে না কিন্তু ধ্বনিমাধুর্যে কেমন আনমনা হয়ে যায়।

'কে মা তুমি এখানে বসে পাঠ করছ?' কে একজন জিগগেস করল একদিন।

'আমি? আমি মা-কালীর মেয়ে। তুমি—তুমি কে?'

'আমি মুচিরাম দাস। মাঝিদের সর্দার।'

'তুমি কী বলতে চাও?'

'বলতে চাই আমাদের কপালেশ্বরে চলো।'

'সেখানে কী ?'

'সেখানেও গঙ্গা। তোমার এখানকার গঙ্গার চেয়ে কপালেশ্বরের গঙ্গা আরো ভালো।'

কী রকম লাগল গৌরীমার, চললেন কপালেশ্বর। দেখলেন কোন এক সিদ্ধ পুরুষের সাধনভূমি। একটি যেন স্নিগ্ধ তপোবন তৈরি হয়ে রয়েছে।

বললেন, 'ঠিক জায়গায় এসেছি। এইখানে আমার জ্যান্ত জগদম্বার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করব। মাতৃশক্তির সেবার আশ্রম।'

মা-ঠাকরুনের কাছে আশীর্বাদ চাইলেন গৌরীমা।

মা বললেন, 'আরম্ভ করে দাও মা, অশেষ কল্যাণ হবে।'

এই প্রথম আশ্রম ব্যারাকপুরে। একখানি মাত্র কুটির, গোলপাতার চাল, ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া আর শানের মেঝে। এই একটি অনাড়ম্বর আরম্ভ।

কিন্তু নামের মধ্যে রইল মহতী প্রতিশ্রুতি। আশ্রমের নাম হল শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম। যিনি সারদাত্রী তিনিই ফলপরিপূর্ণা।

আস্তে-আস্তে একটি দুটি করে মেয়ে ভর্তি হতে লাগল।

ঠাকুর বললেন, 'ভক্তের দুই লক্ষণ, রস আস্বাদন আর রস বিতরণ।' গৌরীমা এই রস বিতরণ করতে বসলেন। নিজের কাজ গুছিয়ে একা-একা সরে পড়লেন না। যে শাশ্বত আনন্দের তিনি সন্ধান পেয়েছেন তা নিজের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখলেন না, সবাইকে দিলেন তার আস্বাদ। তাঁর শুধু আহরণ নয় তাঁর উৎসর্গ।

উদ্দেশ্য কী আশ্রমের ? হিন্দুধর্মের আদর্শানুযায়ী স্ত্রীশিক্ষার প্রসার। সংঘগঠন। সদ্বংশজাতা দুঃস্থা বালিকা ও বিধবাদের আশ্রয়দান ও আদর্শ জীবনের প্রতি আভিমুখ্য রচনা।

'ওদের বড় কষ্ট।' বলতেন ঠাকুর।

সেই কষ্টের লঘূকরণ।

এক কথায়, নারীর মুকুটমণি যে সারদেশ্বরী তাঁর আদর্শচ্ছায়ায় বসে জীবনের অনুশীলন।

মাতা সারদেশ্বরীকে একদিন গৌরীমা নিয়ে এলেন আশ্রমে।

কুমারী সধবা বিধবা—প্রায় পঁচিশ জন আছে আশ্রমবাসিনী। কী এঁদের জীবনযাপনের পদ্ধতি-প্রণালী?

ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ, জপধ্যান, গঙ্গাস্নান, পূজাপাঠ, পাঠাভ্যাস, গৃহচর্যা, ধর্মালোচনা। আশ্রমেই বাস, আহার, সব কিছু।

কী খাও তোমরা?

একবেলা হয়তো ভাত, পাতলা ডাল আর তেঁতুলের অম্বল আর রাত্রে শুধু মুড়ি। কিন্তু তাই আমরা অমৃত করে খাই। কেন খাব না? তার সঙ্গে মেশে যে আমাদের যোগিনী-মায়ের সেবাযত্ন, তার আস্বাদের দাম কে দেয়? কত দেখছ স্থানাভাব, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে রয়েছে যে মার স্নেহস্পর্শ, সে আরামের তুলনা কোথায়?

এরা যে সব তৃপ্তির প্রতিমূর্তি, শান্তির পূর্ণঘট।

'এই নতুন দুজন সধবা এসেছে আশ্রমে।' গৌরীমা দেখাচ্ছেন মাকে।

'বা, এর বেশ সতীসাধ্বী।'

'এটি একটি বালবিধবা। নাম বিমলা।'

'এর যে যোগিনীর লক্ষণ রয়েছে গো। এ যে সন্নেসী হবে।'

শুনে বিমলার কী আনন্দ! আর যেদিন সে সত্যি সন্ন্যাসে দীক্ষিত হল সেদিন তার আরো আনন্দ।

'এ দুটি মেয়ে কোথায় পেলে?' মা-ঠাকরুন নিজের থেকেই উথলে উঠলেন।

'এরা আমার এক পাঞ্জাবী শিষ্যের মেয়ে।'

'বলো কী! এরা যে জয়া-বিজয়া।'

'সত্যি?' যত না আনন্দ গৌরীমার তার বেশি আনন্দ বোন দুটির।

'ক জন্ম এদের সংসার হয়নি এমনি ক্ষেত্র। এ জন্মও হবেনা।'

জয়া-বিজয়াও দীক্ষা নিল সন্ন্যাসে।

'আর এই ছোট্ট লক্ষ্মী মেয়েটি কে?'

'এ আমার দুর্গা।' বললেন গৌরীমা, 'শারদীয়া নবমীপূজায় এর জন্ম। আমি তখন পুরুলিয়ায় হিন্দুজনসাধারণের অনুরোধে দুর্গাপূজায় নিমগ্ন।'

'এও সন্নেসী হবে।'

পর-পর কটি ভাই মারা যায় দুর্গার। এক সাধু এসে তার মাকে বললে, 'ভগবানকে যা দান করা যায় তার আর ক্ষয় হয়না। এবার যে সন্তান হবে তাকে ভগবানে স'পে দিও, তাহলেই বেঁচে থাকবে।'

'বেঁচে থাকবে?' জননী ব্যাকুল হয়ে বললে, 'তাই দেব। শুধু বাঁচুক, বেঁচে থাকুক, এর বেশি আমি চাই না।'

দুর্গা এল কিন্তু জননী চোখ বুজল।

তিন বছর বয়স থেকে দুর্গাকে তার পিতামহী আশ্রমে নিয়ে আসেন, কোনো কোনো দিন বা রেখে যান গৌরীমার কাছে। দুজনের মধ্যে যেন জন্ম-জন্মান্তরের টান। জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয়।

দুর্গার যখন পাঁচ বছর বয়েস, গৌরীমা বললেন তার আত্মীয়দের, 'কি গো, মনে আছে তো? সেই মেয়েকে দেবতার পায়ে সমর্পণ করে দেওয়া?'

'সে আবার কেমনতরো কথা?' আত্মীয়রা অবাক হবার ভাব করল।

'বটে? সেই সাধুর কাছে প্রতিজ্ঞা করোনি?' গর্জে উঠলেন গৌরীমা।

'কোথায় সাধু? কোথাকার সাধু?'

'দেবতাকে তবে ফাঁকি দিতে চাও?' চোখ মুখ আগুন হয়ে

উঠল গৌরীমার : 'তাঁর মানতকরা জিনিস নিতে চাও ফিরিয়ে? ভাবছ এতে কল্যাণ হবে তোমাদের?'

সকলে প্রমাদ গুনল। 'কী করতে হবে তবে বলো? কী করে দেওয়া যায় দেবতাকে?'

'শ্রীক্ষেত্রে চলো।' বললেন গৌরীমা, 'সেখানে জগন্নাথকে মেয়ে সম্প্রদান করো।'

'এ কখনো হয়?'

'কেন হবেনা? খুব হয়। আমি বলছি হবে। চলো না আমার সঙ্গে মেয়ে নিয়ে।'

যদি হয়ও, সে কী রকম হবে? দুর্গার বাবা বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় আর তার দিদিমা তবু বুঝি গড়িমসি করছেন। আমাদের কী হবে?

'তোমাদের কী হবে মানে? ত্রিভুবনের অধীশ্বর তোমাদের জামাই হবেন—এর চেয়ে বড় সম্পদ বড় সৌভাগ্য তোমরা কী চাও?'

ঠেকানো গেল না গৌরীমাকে। দুর্গাকে নিয়ে রওনা হলেন শ্রীক্ষেত্রে। সঙ্গে তার মামা, দিদিমা ও আরো অনেক আত্মীয়। মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা গোবিন্দ শৃঙ্গারীর কাছে গিয়ে গৌরীমা জানালেন অভিপ্রায়।

অভিনব প্রস্তাব। গোবিন্দ বললে, 'কই, খুকিকে দেখি।'

দুর্গাকে দেখল গোবিন্দ। দেখল দিব্যশ্রীতে ভরা শুভলক্ষণা মেয়ে।

বললে, 'রাজাকে জানাই। রাজার মত নিই।'

কী ব্যাপার? একটি পঞ্চমবর্ষীয়া বাঙালি ব্রাহ্মণকন্যাকে পুরুষোত্তমের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইছেন গৌরী মায়ী।

গৌরী মায়ীকে চিনলেন রাজা। কিন্তু জগন্নাথের সঙ্গে মানবীর বিয়ে! এ কখনো হতে পারে?

মতানৈক্য দেখা দিল। তখন গৌরীমা বললেন, বিচারসভা ডাকো। পণ্ডিতেরা মীমাংসা করে দিক। বিগ্রহের সঙ্গে মানুষের বিয়ে হয় কিনা? চিরজীবনের জন্য মানুষকে উৎসর্গ করে দেওয়া যায় কিনা। শাস্ত্র কী বলে?

বসল বিচারসভা। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করে দিল, হতে পারে বিয়ে।

রাজা তখন মত দিলেন।

শ্রীমন্দিরের মণিকোঠায় রত্নবেদীর উপর দুর্গাকে তোলা হল। নববধূর বেশে সুসজ্জিতা দুর্গা! পিতার অনুমতি নেওয়া আছে, দুর্গার দিদিমা দুর্গাকে জগন্নাথের হাতে সম্প্রদান করে দিল। বরের দিকে পুরোহিত গোবিন্দ শৃঙ্গারী আর কনের দিকে পুরোহিত গোবিন্দর ছেলে বৃন্দাবন।

'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব লক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

যে রমণী আরাধনা করেন তিনিই রাধিকা। কৃষ্ণপ্রীতিতেই সমস্ত আরাধনার পর্যাবসান। কৃষ্ণপ্রীতি কিসে? কৃষ্ণের বাসনা-পূরণে। কৃষ্ণের বাসনা কী? অহৈতুক অকৈতব ভক্তি। তাই রাধিকা কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্তির প্রতিমূর্তি। তার ইচ্ছা শুধু কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা। তার তৃপ্তি শুধু কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী—রাধিকা কৃষ্ণময়ী। তার ভিতরে-বাইরে কৃষ্ণ। 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।' যখন চোখ বোজে, হৃদয়ের মধ্যে চিত্ত-চোর কৃষ্ণকে দেখে। আর যখন চোখ মেলে তখনও শুধু কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপন। তমালে বা নবমেঘে দৃষ্টি পড়লে কৃষ্ণের বর্ণ মনে পড়ে, ইন্দ্রধনুতে চোখ পড়লে মনে পড়ে চূড়ায় বাঁধা ময়ূরপুচ্ছ, আকাশে হংসবলাকা দেখলে কৃষ্ণবক্ষের মুক্তামালা। রাধিকাই তো কৃষ্ণের শক্তি, মূর্তিমতী হ্লাদিনী। দেবী দ্যোতমানা, দীপ্তিশালিনী, জ্যোতির্ময়ী।

‘গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্বস্ব—সর্বকান্তা-শিরোমণি ॥’

শ্রীশ্রীমা সারদেশ্বরীরই দীক্ষা দিলেন দুর্গাকে। পরে আবার সন্ন্যাসও দি’লেন তিনি। বললেন, গৌরীর কর্মভার গ্রহণ করবার সামর্থ্য এই মেয়েটিরই আছে। উদার স্নেহে আশীর্বাদ করে দিলেন।

কিন্তু আত্মীয়ের দল আবার বাধা দিতে এল। জগন্নাথকে সম্প্রদান করা হয়েছে এতেই তো প্রতিজ্ঞা পূরণ হল, তবে গৌরীমা দুর্গাকে ছাড়েন না কেন? নিজে যোগিনী বলে কি দুর্গাকেও যোগিনী করবেন নাকি? গৃহস্থাশ্রমে দেবেন না আসতে?

না. এ মেয়ে সন্ন্যাসিনী হয়েছে। এ আমার দামোদরসেবার আশ্রমসেবার মহত্তম আধার। এ চিরকুমারী। উচ্চশিক্ষার অম্লানবর্তিকা। একে আমি ছাড়তে পারব না।

‘গৌরমা, পালাও।’ বললেন এসে সারদানন্দ। ‘খুকিকে যদি এই পথে রাখতে চাও, শিগগির বাঙলা দেশ ছেড়ে চলে যাও দূরে।’

সারদানন্দই দুর্গা দেবীর সন্ন্যাস অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি পাথেয় স্বরূপ টাকা দিলেন গৌরীমাকে। ঠিকানা দিলেন কোথায় গিয়ে উঠলে নিরাপদ হবে।

দুর্গাকে নিয়ে পালালেন গৌরীমা। মাদ্রাজ হয়ে আবার শশী-মহারাজের চিঠি নিয়ে চলে গেলেন শোলাপুর। উঠলেন স্বামীজির প্রথম শিষ্যা, হরিপদ মিত্রের স্ত্রী ইন্দুমতীর বাড়িতে। সেখানে চারমাস থেকে গেলেন পাণ্ডারপুর। পাণ্ডারপুর থেকে পুনা, বেলগাঁও,

বোম্বাই। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালেন। করলেন অজ্ঞাতবাস কার সাধ্য কেউ ছিনিয়ে নেয় আমার কন্যাকে। আমার কণ্ঠের অমল হারকে।

কলকাতায় রটে গেল গৌরীমা মারা গেছেন।

দুর্গাপূজার সময় ফিরলেন কলকাতায়। শ্যামনগরে এক ভক্তের বাড়িতে উঠলেন। তারপর একদিন সটান হাজির হলেন বেলুড়ে।

'ওরে, কী আশ্চর্য, ঐ ছাখ গৌরীমা আসছেন।' মঠের একতলার বারান্দায় বসে শিবানন্দ, গিরিশ ঘোষ ও আরো কেউ-কেউ গল্প করছিল, সবাই সমস্বরে আনন্দধ্বনি করে উঠল। গিরিশ তো ছুটে এল কাছে। বললে, 'মা, তা হলে আপনি বেঁচে আছেন? আমাদের ছেড়ে তা হলে চলে যাননি?'

গৌরীমা হাসলেন। বললেন, 'তোমাদের ছেড়ে কি চলে যেতে পারে কৃষ্ণভক্তি?'

সবাই পরামর্শ দিল দুর্গা-মার সম্পর্কে তার আত্মীয়দের সঙ্গে একটা মীমাংসা করে ফেলাই সমীচীন হবে।

বিপিনবিহারীর সঙ্গে দেখা করলেন গৌরীমা।

আর যেন প্রতিবাদ করার জোর পেলেন না বিপিনবিহারী। বললেন, 'আমার কন্যার যা ইচ্ছে, তার যোগিনী মার যা ইচ্ছে, সর্বোপরি পুরুষোত্তম জগন্নাথের যা ইচ্ছে তাই হোক।'

তাই হল। গোবিন্দে গতবাককায়মানসা দুর্গা দেবী আশ্রমে অধিষ্ঠিতা হলেন। কিন্তু আশ্রম বুঝি থাকে না। গভর্ণমেন্ট নোটিশ দিয়েছে আশ্রমের জমি জলকলের জন্য নেওয়া হবে। ছেড়ে দাও, সরে পড়ো।

ভক্ত মুচিরাম আশ্রম বাটির রক্ষক। দুঃখ করে বললে, 'যোগিনী-মা, সরকার জমিই নেবে, আশ্রম তো নিতে পারবে না। আশ্রম আপনি নিশ্চয়ই অন্য জায়গায় সরাবেন।'

'এবার কলকাতায় নিয়ে যাব।'

'হ্যাঁ, তাই বলছিলাম। আমারই শুধু শ্রীচরণদর্শন হবে না।' মুচিরামের চোখ ছলছল করে উঠল : 'আমারই বুঝি মায়ের সেবা করা উঠে গেল।'

'তুমি তো গঙ্গার সেবা করো। গঙ্গাই তোমার মা, মুচিরাম।'

গৌরীমার টাইফয়েড হল, আর তাঁর সেবা করার ভার নিল ভক্ত গোপাল ভট্টাচার্য, উত্তরকালে যে নবদ্বীপে ললিতা-সখী।

ভালো হয়ে উঠেছেন, দামোদরকে ভোগ দিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছেন গৌরীমা। ভেজিয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে গান ধরলেন :

মাধব ! বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমপিনু—
দয়া জানি না ছোড়বি মোয়॥

এমন প্রাণঢালা মধুর কণ্ঠ কোনোদিন শোনেনি গোপাল। ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে তাকিয়ে বিহ্বল হয়ে গেল। দেখল গৌরীমা বুকে দামোদরকে ধরে আত্মহারা হয়ে কাঁদছেন, সেই নিরর্গল অশ্রুতে দামোদরের স্নান হয়ে যাচ্ছে। এত আর্তি, এত আকিঞ্চন, এত আকুলতা, এত আত্মনিবেদন আর যেন কোনোদিন দেখেনি গোপাল।

দুপুরবেলা সব কাজকর্ম সেরে শুয়েছেন গৌরীমা, কিন্তু কেন কে জানে, বিশ্রাম করতে পারছেন না, ছটফট করছেন।

'কী হল বলো তো—'

কে কী বলবে কী হল।

কতক্ষণ পর নিজেই বললেন, 'কত্তার আজ দুধ খাওয়া হয়নি, তাই কত্তার ঘুম আসছে না। যাই দুধ দিয়ে আসি।'

ঠাকুরঘরে গিয়ে দামোদরকে দুধ দিয়ে এলেন গৌরীমা।

দুধ খেয়ে ঘুমুল দামোদর। গৌরীমা তখন চোখের পাতা একত্র করলেন।

সেদিন গৌরীমার শরীর খারাপ, রাত্রিতে রান্না হল না দামোদরের জন্যে। শুধু ফল মিষ্টি ভোগ দেওয়া হল। গৌরীমা ঘুমিয়েছেন, হঠাৎ মাঝরাতে জেগে উঠলেন। রান্নাঘরে গিয়ে উনুন জ্বাললেন। লুচি ভাজতে বসলেন।

ভক্ত মেয়ে জিগগেস করল, 'এত রাতে লুচি কিসের?'

গৌরীমা বললেন, 'এক ঘুমের পর কত্তা বললেন, ওঠো, আমার খিদে পেয়েছে। ফল মিষ্টিতে কখোনো পেট ভরে?'

গৌরীমার হাতের রান্না প্রসাদ ভারি সুস্বাদু। স্বামীজি কত দিন খেয়েছেন। একদিন বললেন, 'গৌরীমা, তুমি মরে গেলে তোমার ডানহাতখানা কেটে রেখে দেব। আমাদের প্রসাদ রেঁধে দেবে।'

ব্যারাকপুর আশ্রমে এসেছেন দুবার। বলেছেন, আমাদের সেবার সাধনা 'আত্মনাং মোক্ষায় নয়, শুধু জগদ্ধিতায়।'

আরো বলছেন, 'তারাই যথার্থ জীবিত যারা অপরের জন্যে জীবন ধারণ করে। পরের সেবার জন্য আমি নরকে পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত। যে রামকৃষ্ণের ছেলে সে আপনার ভালো চায় না, প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ—প্রাণত্যাগ হলেও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী তারা। যারা নিজের আয়েস চায়, কুঁড়েমি চায়, যারা নিজের জেদের সামনে পরের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাৎ হয়ে যাক ভালোয়-ভালোয়। তাঁর চরিত্র তাঁর শিক্ষা তাঁর ধর্ম চারদিকে ছড়াও—এই সাধন এই ভজন এই সিদ্ধি।'

আবার বলছেন: 'গোলাপ-মা গৌর-মা মেয়েদের মন্ত্র দিয়ে দিকনা কেন। একবার জায়গা হলে মা-ঠাকরুনকে কেন্দ্র করে গৌর-মা গোলাপ-মা একটা বেডোল হুজ্জুক মাচিয়ে দিক।'

সাময়িক জায়গা হয়েছে, মা-ঠাকরুনকে কেন্দ্র করে আশ্রমও হয়েছে কিন্তু তেমন অঢেল টাকা কই?

'হুড়হুড় করে টাকা আসা উচিত ছিল।' বললেন স্বামীজি, 'তখন বললুম গৌরমাকে, চলো আমার সঙ্গে আমেরিকায়। ওরা দেখত আমাদের ভারতবর্ষেও কেমন মেয়ে জন্মায়। আর একবার ঘুরে এলে টাকার কত সুবিধের হত। তা গৌরমা গেলেন না, জাত যাবে বলে।'

তা টাকার জন্যে বসে থাকবে না কিছু। যেখানে অনুপ্রাণনা আছে, চেষ্টা আছে, নিষ্ঠা আছে, সেখানে আসবে সাফল্য। 'বিপদ তো সংসারে পদে-পদে', বললেন গৌরীমা, 'তবে বিপদহারীও আছেন সঙ্গে-সঙ্গে।'

গোয়াবাগানে ভাড়াটে বাড়িতে আশ্রম উঠে এল। ভালোই হল। কাছেই 'উদ্বোধনে' মা-ঠাকরুন আছেন, সময়ে-অসময়ে গৌরীমা আশ্রমের মেয়েদের নিয়ে যেতে পারবেন তাঁর কাছে। দেখিয়ে আনতে পারবেন 'জ্যান্ত দুর্গা' কাকে বলে।

'এ আশ্রমে কারা থাকে বে?'

'মেয়েমানুষ।'

গর্জে উঠলেন গৌরীমা: 'বলো মা-মানুষ। ঐ মেয়েমানুষ কথাটা তুলে দাও অভিধান থেকে। মাতৃজাতিকে সম্মান করতে শেখ।'

'আর স্বামীজি সন্ন্যাসীরা যোগিনী-মায়ের কে হয়?'

'ওরা আমার ছেলে।'

স্বামীজিকে নিয়ে গৌরীমা গিয়েছেন তারকেশ্বর, সঙ্গে যোগানন্দ আর অদ্বৈতানন্দ—ঠাকুরের বুড়ো-গোপাল। রাস্তায় এক পুকুরের ঘাটে দামোদরের পুজো করে ভোগ দিলেন।

কয়েকজন পল্লীরমণী আকৃষ্ট হয়েছেন। 'ওঁরা আপনার কে?'

'ওরা আমার ছেলে।'

'আর ঐ যে বুড়ো সাধুটি দেখছি ও-ও আপনার ছেলে ?' বুড়ো গোপালের দিকে লক্ষ্য করল মেয়েরা।

গৌরীমা গম্ভীর মুখে বললেন, 'ও আমার সতীন-পো।'

পথে চলতে-চলতে বললেন স্বামীজি, 'ভাগ্যিস বুড়ো হইনি, তাহলে আমাকেও আজ সতীন-পো হতে হত।'

বলছেন স্বামীজি, 'যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন বা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরো রুটি দিতে পারে না, আমি সে ধর্ম বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিনা। লোকে কী বলল সে জন্যে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। আমার ভগবানকে, আমার ধর্মকে, আমার দেশকে আমি ভালোবাসি। নিপীড়িত, অশিক্ষিত ও দীনহীনকে আমি ভালোবাসি। তাদের বেদনা অন্তরে অনুভব করি। কত তীব্র ভাবে অনুভব করি তা প্রভুই জানেন। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। প্রভুর কাজ চিরদিন দীনদরিদ্রেরাই সম্পন্ন করেছে। যেন ঈশ্বরের প্রতি গুরুর প্রতি ও নিজের প্রতি বিশ্বাস অটুট থাকে। প্রেম আর সহানুভূতিই একমাত্র পথ। ভালোবাসাই একমাত্র উপাসনা।'
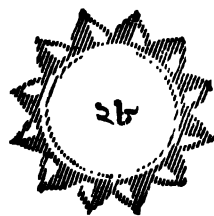
'গৌরীমার আশ্রমে কিছু টাকা দাও না।' ঠাকুরের এক ধনী ভক্তকে বললে একদিন গিরিশ।

'দিয়ে কী হবে ? গৌরীমার কিছু ঠিক আছে ? আজ এখানে কাল বৃন্দাবনে পরশু হরিদ্বারে—এ তো ওঁর লেগেই আছে। এ করলে কি চলে আশ্রম ?'

'সিংহীকে ঠাকুর খাঁচায় পোরেন নি।' গর্জে উঠল গিরিশ: 'তাই হুচারটে খাঁটি মেয়ে তৈরি না করে পালাবার সাধ্য নেই তাঁর। তোমার দিতে হবে না টাকা। মেয়ে যদি একটাও ঠিক তৈরি হয় সেই আশ্রমের ভার নিয়ে সিংহীকে পারবে ছুটি দিতে। আর টাকার জন্যে মহৎ সৃষ্টি কখনো বসে থাকবে না।'

দুর্গাকে নিয়ে জয়রামবাটিতে মা-ঠাকরুনের কাছে এসেছেন গৌরীমা। দুর্গাকে দেখে মার আনন্দ আর ধরে না। বললেন, 'দেখ মা, চড় খেয়ে রাম নাম অনেকেই বল্লে, কিন্তু শৈশব হতে ফুলের মত মনটি যে ঠাকুরের পায়ে দিয়ে দিতে পারে, সেই ধন্য। গৌরদাসী কেমন তৈরি করেছে মেয়েটিকে। ভায়েরা বিয়ে দেবার বহু চেষ্টা করেছিল। গৌরদাসী ওকে লুকিয়ে নিয়ে হেথা-সেথা পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াত। শেষে পুরী নিয়ে গিয়ে জগন্নাথের সঙ্গে মালা বদল করে সন্ন্যাসিনী করে দিলে। সতী লক্ষ্মী মেয়ে, কেমন লেখাপড়াও শিখেছে দেখ না। কি একটা সংস্কৃত পরীক্ষাও দেবে শুনেছি।'

পরে তাকালেন রাধুর দিকে। বললেন, 'এই রাধুকে নিয়েই আমার কত মায়া দেখ না। গৌরদাসী কেমন তার মেয়েকে তৈরি করেছে, আর আমি একটা বাঁদরী তৈরি করেছি।'

দুর্গা, ঐটুকু মেয়ে, কলকাতা থেকে সমস্ত পথ হেঁটে এসেছে জানতে পেরে মা তাকে অনেক আদর করলেন। গৌরীমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'যারে ঘুমালে চিয়াতে নারি, করলে বিধি দণ্ডধারী।'

দুর্গাকে বললেন, 'যাও সিংহবাহিনীকে দেখে এস। তাঁকে তোমার প্রার্থনা জানাও। তিনি বড় জাগ্রত দেবী। আমাকে যে কত ভাবে দয়া করেছেন তা বলবার নয়।'

কিন্তু আমাদের আশ্রমের উপর কি তাঁর দয়া হবে না?

সেদিন আশ্রমে কুমারীদের জন্যে খাবার কিছু সংস্থান নেই। তাঁর মানে? তাঁর মানে, অভাব, দারিদ্র্য, অনটন।

তা হলে মেয়েগুলো কি উপোস করে থাকবে?

গোপাল যদি তাই রাখে তাই থাকবে। দেখি তার কি ইচ্ছে।

ভিক্ষায় বেরুলেন গৌরীমা। অহঙ্কারকে উচ্ছিন্ন করবার জন্যে ঠাকুর এই ভিক্ষে করা শিখিয়েছিলেন সন্তানদের। ভিক্ষান্ন শুদ্ধান্ন।

সম্ভ্রান্ত এক গৃহস্থ বাড়ির দ্বারস্থ হয়েছেন গৌরীমা।

চারদিকে গরিমার ছটা, এ কে মূর্তিমতী পার্বতী এসে দাঁড়িয়েছে। গৃহকর্ত্রী এগিয়ে এলেন : 'কে আপনি?'

'আমি? আমি ভিখারিণী।' প্রশান্ত মুখে হাসলেন গৌরীমা।

'কী চাই বলুন।'

'একটি আশ্রম করেছি, কতগুলো মেয়েকে নিত্য খেতে দিতে হয়।' নির্মল সারল্যে মধুর গৌরীমার কণ্ঠ : 'আজ দেখছি ঘরে কিছু নেই। তাই তোমার কাছে এসেছি ভিক্ষে করতে।'

হাতে শাঁখা, মাথায় সিঁদুর, হলই বা না গেরুয়া পরনে, গৃহকর্ত্রী তাকালেন তীক্ষ্ণ চোখে। জিগগেস করলেন, 'আপন স্বামী কী করেন?'

'স্বামী সন্নেসী হয়ে গেছেন মা ' তাই দেখছ না আমিও সন্নেসী হয়েছি।'

'কী, কী নাম তোমার মা?

'আমার নাম? আমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।'

চাল ডাল তরিতরকারি অনেক তাঁকে দিলেন গৃহকর্ত্রী। চাদরে করে বেঁধে নিলেন গৌরীমা। চললেন কাঁধে ঝুলিয়ে, পায়ে হেঁটে।

গৃহকর্ত্রী তাঁর কিশোর পুত্রকে বললেন, চুপি চুপি দেখে আয় তো কোথায় যায়। সত্যি কোনো আশ্রম আছে কিনা।

গুপ্তচরের মত ছেলেটি চলল পিছে-পিছে।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাভূষণ মশাই যাচ্ছেন গাড়ি করে। পথে গৌরীমাকে দেখে তিনি গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন। পায়ের ধুলো নিলেন। বললেন, 'আমার গাড়িতে আসুন।'

গৌরীমা গাড়িতে উঠতেই ছেলেটি পিছনের পাদানিতে লাফিয়ে উঠল। দেখে এল আশ্রম। শুনে এল সারদেশ্বরীর কথা।

মাকে এসে বললে, 'মা, সে এক মস্ত ব্যাপার। মহৎ ব্যাপার।'

গৃহকর্ত্রী নিজেই সটান চলে এলেন আশ্রমে। গৌরীমাকে প্রণাম করে বললেন, 'সেদিন আপনাকে চিনতে পারিনি, মা, আমাকে ক্ষমা করুন।'

গৌরীমা হেসে বললেন, 'বা চিনতে পেরেছিলে বই কি। আপন জন বলে চিনেছিলে বলেই তো আমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিলে। এতে ক্ষমা চাইবার কী আছে?'

কী সামান্য দিয়েছি সেদিন! আরো দেব, আরো লাগব জগন্মাতাদের সেবায়।

মা-ঠাকরুন বললেন, 'গৌরদাসীর আশ্রমের সলতেটি পর্যন্ত যে উসকে দেবে, তার কেনা বৈকুণ্ঠ।'

একদিন সরাসরি বললেন গৌরীমাকে, 'ঠাকুরের কাছে টাকার কথা বল না কেন?'

গৌরীমা চুপ করে রইলেন।

'তুমি চাইলেই তো তিনি সব অভাব পূরণ করে দেন।' বললেন আবার মা-ঠাকরুন।

গৌরীমা বললেন, 'আমি যে মা, ঠাকুরের পায়ে লিখে দিয়েছি, টাকাকড়ি কিছু চাইব না।'

'সে কী গো, না চাইলে চলবে কেন? ঠাকুর যখন তোমায়

জ্যান্ত জগদম্বার সেবায় নামিয়েছেন, তুমি চাইলেই তিনি ঢেলে দেবেন।'

'কিন্তু মা, আমি যে তাঁর পায়ে লিখে দিয়েছি শুদ্ধা ভক্তি ছাড়া কিছুই চাইব না। তোমাদের ইচ্ছে হলে তোমরাই দেবে, আমি চাইতে যাব কেন?'

কত কাঠিন্য কত দারিদ্র্য কত নৈরাশ্য, তবু গৌরীমা নির্বিচল। সংগ্রাম করবার জন্যেই তো শক্তি। পথ কণ্টকাকীর্ণ বলেই তো প্রাপ্তি মহৎ। অধ্যবসায় আর ধৈর্য এই আমার দুই বাহু। স্বভুজবীর্যে অর্জন করব সিদ্ধিকে। কুশের অগ্রভাগ দিয়ে এক বিন্দু এক বিন্দু করে সমুদ্র শোষণ করব।

মা-ঠাকরুন আশ্রমবাসিনীদের উদ্দেশ করে বললেন, 'গৌরদাসী যখন চাইবে না আমিই তোমাদের ভোজ্য পাঠাব, কিন্তু যদৃচ্ছালাভ, যখন যা পাবে তখনই তা সকলে ভাগ করে নেবে। কাল খাবে পরশু খাবে বলে ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করে রাখবে না।'

মহেন্দ্র শ্রীমানী আশ্রমের জন্যে গাড়ি ও ঘোড়া কিনে দিল।

গৌরীমা ঘোড়ার নাম রাখলেন 'সারদেশ্বরী দাস।'

মাঝে মাঝে সেই গাড়িতে করে মা-ঠাকরুন যান গঙ্গাস্নানে। কিন্তু একদিন ঘোড়া রাস্তার মাঝখানে খেপে গেল, গাড়ি প্রায় ফেলল উলটিয়ে! মা-ঠাকরুন বললেন, 'এ ঘোড়াকে বিদায় দিয়ে একটা ভালো ঘোড়া কেন। আমার দাসকে দিয়ে কাজ হবে না, একটি রামদাস ঘোড়া কেন।'

ঘোড়াটাকে বেচলে কিছু অর্থাগম হত কিন্তু গৌরীমা সেপথে গেলেন না। পিঁজরাপোলে পাঠিয়ে দিলেন। এক ভক্তের কাছ থেকে টাকা এল অকস্মাৎ, নতুন ঘোড়া কেনা হল। নতুন ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে গৌরীমা এলেন মার কাছে। তুমিই প্রথম চড়বে মা।

আমার রামদাস এসেছে—মা-ঠাকরুন উঠলেন গাড়িতে।

বেলেঘাটা থেকে গৌরীমা ফিরছেন ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়িতে, সঙ্গে তাঁর দামোদর। গাড়ি ভাড়া নেবার সময় বললেন গাড়োয়ানকে, 'শোনো, আমার সঙ্গে ঠাকুর আছেন, গাড়ির ছাদে যেন কেউ না ওঠে।'

ঠিক আছে। রাজি হল গাড়োয়ান।

শেয়ালদা ছাড়িয়ে এসেছে গাড়ি, হঠাৎ একটি ছেলে গাড়িব ছাদের উপর গিয়ে বসল।

'ছাদে কে উঠল?' গৌরীমা জিগগেস কবলেন।

'ও কেউ না।

'কেউ না মানে?'

'ও আমার লোক।'

'ও সব চলবে না, গাড়ি থামাও বলছি।'

গাড়োয়ান গ্রাহ্যও করল না, বললে, 'ও গাড়ির লোক, ও গাড়িতেই থাকে।'

'তুমি গাড়ি থামাও বলছি।' প্রচণ্ড হুঙ্কার ছাড়লেন গৌরীমা।

আদেশ অমান্য করে গাড়ি চালাল গাড়োয়ান। জোরে চালাল।

'আমি তোর গাড়িতে যাব না, কিছুতে যাব না।' চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লেন গৌরীমা। কী আশ্চর্য, পায়ে ঠিক মাটি পেলেন, পড়লেন না ছিটকে। কে ঠিক তাঁকে দু পায়ে দাঁড় করিয়ে দিল।

গাড়ি থেকে নেমে নিরস্ত হলেন না গৌরীমা। ছুটে গেলেন, গাড়োয়ানকে টেনে নামাবেন গাড়ি থেকে। কেন সে কথা দিয়ে কথা রাখেনি। কেন অমান্য করেছে প্রতিশ্রুতি।

স্থান রাজাবাজার, সময় প্রায় সন্ধে। তবু সত্যে স্থিতা গৌরীমা ভ্রূক্ষেপ করলেন না, বললেন, ধরো গাড়োয়ানকে।

গেরুয়াধারিণী এক সন্ন্যাসিনী গাড়োয়ানকে শাসন করতে উদ্যত, দেখতে দেখতে বহু লোক জড় হয়ে গাড়িকে ঘিরে ধরল।

এক বুড়ো মুসলমান এগিয়ে এসে জিগগেস করলে, 'কী হয়েছে মা ?'

'গাড়োয়ানের সঙ্গে কড়ার ছিল আমার মাথার উপর, গাড়ির ছাদে কেউ বসবে না। সে চুক্তি ভেঙে ও এক ছোকরাকে এনে ছাদে বসিয়েছে। দেখুন, আপনারা দেখুন, কেন ও কথার খেলাপ করবে ?'

মুহূর্তে কী হয়ে গেল কে জানে। বুড়ো মুসলমান গাড়োয়ানের কাছে কৈফিয়ত তলব করল কেন সে ইমান রাখেনি।

মুহূর্তে ভোজবাজি হয়ে গেল। 'মাইজি, মেরা কসুর মাপ কিজিয়ে।'

ছোকরাকে নামানো হল ছাদ থেকে। দামোদরকে নিয়ে গৌরীমা নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন গাড়িতে।

বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন রাখালকে দেখতে। নৌকো করে ফিরছেন, নেমেছেন বাগবাজার ঘাটে।

ভাড়ার যা কথা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি চাইছে মাঝিরা।

যে সেবক এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত, সে কিছুতেই বেশি দিলে না। ন্যায্যের বাইরে এক পয়সাও না।

তখন সর্দার মাঝি কুৎসিত একটা গাল দিয়ে বসল।

সেবক, যদিও তার গায়ে প্রচুর শক্তি, গালটা গায়ে মাখল না। এ নিয়ে হাঙ্গামা করতে গেলে গৌরীমা হয়তো বিরক্ত হবেন। হজম করে গেলেন।

গৌরীমা যাচ্ছিলেন এগিয়ে, থেমে পড়লেন। দেখলেন অসাধারণ বলিষ্ঠ হয়েও সেবক প্রতিবাদ করলেন না। তখন নিজেই তিনি রুখে গেলেন মাঝির দিকে। বললেন, 'তুই আমার ছেলেকে

অকারণে গাল দিলি কেন?' বলেই মাঝিকে এক চড় মেরে বসলেন।

মাঝি স্তম্ভিত হয়ে গেল।

হৃষ্টপুষ্ট সেবককে তখন ধমকে উঠলেন গৌরীমা: 'একটা মরদ হয়ে গালটা বেমালুম হজম করে ফেললে? তোমাদের আত্মসম্মান বলে কিছু নেই? দেহে তবে বল কেন স্বাস্থ্য কেন? বেশ তো দুঘা দিয়েই না হয় খেতে দুঘা।'

লোকজন জড় হল। কিন্তু কেউই মাঝির পক্ষ নিল না। আরো মার খাবার ভয়ে মাঝি পালাল নৌকো নিয়ে।

'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।' 'অহিতান বিনিহংসি।' দুর্বৃত্তদের প্রশমিত করে আমাদের অসুরভীতি দূর করো।

বহু জায়গায় ঘুরেছেন গৌরীমা, বাঙলায় বিহারে উড়িষ্যায় আসামে পাঞ্জাবে হিমালয়ে—ঠাকুরের ভাবপ্রচারে, আশ্রমের আদর্শপ্রচারে। কিন্তু সকল স্থানের সেরা স্থান মা-ঠাকরুনের পদতল।

কলকাতায় এক ভক্তের সঙ্গে ভোলানন্দ গিরির দেখা। 'আরে এদিকে কোথায় যাচ্ছ?'

'এখানে এক সন্ন্যাসিনী মাতাজি থাকেন, গৌরীমায়ী, তাঁকে দর্শন করতে যাচ্ছি।'

'আরে চলো চলো, গৌরীমায়ীকে যে আমি চিনি।' বললেন ভোলানন্দ, 'হিমালয়ে তাঁর সঙ্গে যে আমার দেখা হয়েছিল।'

আশ্রম-অঙ্গনে আবার তাঁদের দেখা হল। পলকেই মনের মানুষকে চিনে নিলেন পরস্পর।

আশ্রমের আদর্শ ও সন্ন্যাসিনী গঠনের কথা শুনে উচ্ছ্বসিত হলেন ভোলানন্দ। তা হলে আবার জাগবে মৃত্যুঞ্জয় ভারতবর্ষ।

'মাতাজি কী কঠোর তপস্যা যে করেছেন তা তোমরা কলকাতায় বিজলী পাখার তলায় বসে বুঝতে পারবে না।' বললেন ভোলানন্দ, 'আবার দেখ, তপস্যার ফল নিজে ভোগ না করে জগজ্জনকে বিতরণ করছে। কত বড় মহৎ কাজ নিয়ে নেমে পড়েছে দেখ।'

ভুবনেশ্বরে গিয়েছেন গৌরীমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে মঠে নিয়ে এলেন, বললেন, 'মা, তোমাকে আর ছাড়ছি না। তোমার মেয়েদের আমি বলে দিয়েছি তারা নিজেরাই এখন আশ্রম চালাতে পারবে। বলেছি আমাদের মাকে ছুটি করে দাও। আমরা শুধু দক্ষিণেশ্বরের কথা বলব। আর মায়ের হাতের রান্না পেসাদ খাব।'

'তা কি আর হয় রে বাবা?' বললেন গৌরীমা, 'মায়ের চরণ-ছোঁয়া আশ্রমই আমার আশ্রয়।'

আশ্রমের ক্রমশই প্রসার ঘটছে—যাকে প্রথম কাঁকর ভেবেছিলেন তাতে এখন সতেজ শ্যামসমারোহ—গোয়াবাগান থেকে প্রথমে উঠে এল শ্যামবাজার স্ট্রিট, সেখান থেকে রাধাকান্ত জিউ স্ট্রিট, অবশেষে বিডন রো। মা গো, আশ্রমের একটা নিজের বাড়ি হবে না?

'ঐসা ঠাম ন বৈঠনা জো কোই বোলে উঠ।
ঐসী বাত ন বলনা জো কোই বোলে ঝুট॥'

উঠতে বললেই উঠে যেতে হবে এমন জায়গায় থেকো না। এমন কথা বোলোনা যা মিথ্যে। যা সত্যের কষ্টিপাথরে সোনা নয়।

হঠাৎ এক সন্ধ্যায় এক সৌম্যদর্শনা মহিলা আশ্রমে এসে

উপস্থিত। অনাড়ম্বর বেশবাস, হাতে তুগাছি শাঁখা, সীমন্তে সিঁতুর।

এসে বললেন, 'এ আশ্রমে গৌরীপুরী কে ?'

'কেন বলুন তো।'

'আমি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি এই আশ্রমের কথা বলে দিলেন। বললেন ওখানে আমার এক মেয়ে আছে, নাম গৌরীপুরী। আরো বললেন, ওখানে যাও, তার সঙ্গে কথা কয়ে প্রাণে শান্তি পাবে। তিনি কোথায় ?'

গৌরীমার সঙ্গে মহিলার আলাপ হল। ঈশ্বরপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হল। উঠল সাধনভজনের কথা।

'জপধ্যান আর স্মরণমননের পথই সোজা।' বললেন গৌরীমা : 'জপ করতে বসে প্রথমে খানিকক্ষণ হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করবে। তাতে মন শুদ্ধ হবে স্থির হবে। তারপর ইষ্টমূর্তি চিন্তা করতে-করতে জপ করবে। প্রতিদিন সকাল সন্ধেয় তুবেলা অন্তত একশো আটবার ইষ্টমন্ত্র জপবে। অবশ্য যত বেশি করতে পারো ততই ভালো। ভালো না লাগলেও ধৈর্য ধরে লেগে থাকবে। অভ্যাস থেকেই আসবে অনুরাগে। গুরু, মন্ত্র আর ইষ্ট আলাদা ভেবো না। সব এক। আসল কথা, গৃহীই হও আর সন্নেসীও হও, আসল কথা মন। মন সাঁচ্চা তো সব সাঁচ্চা। মন খাঁটি হলেই ধরতে পারবে ঈশ্বরকৃপা। পবিত্র দেহমনে খুব ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়ই যায়। আর তাঁকে না পেলে কিসের এই জীবনধারণ ?'

চলে যাচ্ছেন মহিলা, আশ্রমবাসিনীরা তাঁকে জিগেগেস করল, 'আপনার পরিচয় তো কিছু জানলুম না।'

মহিলা হাসলেন। বললেন, 'আমার নাম সরোজবালা দেবী।'

'ঠিকানা ?'

'গৌরীপুর—আসাম।'

'আপনি কি তবে গৌরীপুরের রানী?'

'না, না, আমি দীনহীন সামান্য মেয়ে।'

'তবে লোকে আপনাকে ঐ নামে ডাকে, তাই না?'

'লোকে কী স্নেহ করে বলে তা আমি গায়ে মাখি না—'

এই গৌরীপুরের রানী সরোজবালাই আশ্রমের নিজ ভবনের জন্যে প্রথম অর্থ দিলেন। আসলে মা-ঠাকরুনই অন্নপূর্ণা আর এ সব ভক্ত নরনারী মায়ের ভারী, রসদদার।

কিন্তু এ সামার গৌরীর কী হল? গৌরীমাকে বিছে কামড়েছে, মা-ঠাকরুন সারারাত ছটফট করছেন। গৌরীমার পায়ে অস্ত্রোপচার হচ্ছে, মা তাকে দুবাহুতে জড়িয়ে ধরে বসে আছেন চোখ বুজে, মাথায় জপ করে দিচ্ছেন।

আর সেবার কী হল? গৌরীমার গায়ের বসন্ত মা-ঠাকরুন ভাগ করে নিলেন।

কলকাতায় শান্তিনাথতলায় বিপিন চৌধুরীর বাড়িতে তখন আছেন গৌরীমা। একদিন চুপচাপ দুপুরবেলায় ধর্মগ্রন্থ পড়ছেন, হঠাৎ দেখলেন মা-ঠাকরুন এসেছেন। মাথার চুল খোলা, কেমন ত্রস্তব্যস্ত ভাব। কী জানি কেন গেরুয়া পরে এসেছেন।

'ও মা গৌরী, তুমি এখানে? আমি তোমার কাছেই এলুম।'

মা একা এসেছেন, গৌরীমা তো অবাক। তবু তাড়াতাড়ি দিলেন আসন পেতে। বললেন, 'কী ভাগ্যি তুমি এসেছ! এখানে বোসো।' বলেই বাড়ির লোকদের ডাকতে লাগলেন: 'ও আশু, ও কেনা, তোরা সব কোথা গেলি? শিগাগর ছুটে আয়। ছাখ কে এসেছে।'

মা-ঠাকরুন বললেন, 'কাউকে ডাকতে হবে না, ঘরে চলো।' বলে নিজেই আগে ঘরে ঢুকলেন।

এমনতরো তো কখনো হয় না, গৌরীমা চলে এলেন মায়ের পিছুপিছু।

ঘরে ঢুকেই গৌরীমাকে বললেন, শোও।

আশ্চর্য, গৌরীমাকে মা-ঠাকরুন শুইয়ে দিলেন মাটিতে। তার পর তাঁর সর্বাঙ্গ ঝাড়তে লাগলেন দু হাতে। মায়ের মুখের দিকে গৌরীমা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইলেন।

ঝাড়া শেষ করে মা বললেন, 'ভেবো না, আমিও কিছু নিয়ে চললুম।' বলে হঠাৎ বাইরে রওনা হলেন।

গৌরীমা চাইলেন তাঁকে অনুসরণ করতে। পারলেন না। ফিরে এসে শুয়ে পড়লেন মুহ্যমানের মত।

ঘরে বসে বালিকা দুর্গা লেখা পড়া করছিল। সে শুধু দেখল গৌরীমা একবার ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন, শুলেন মাটিতে, তারপর আবার বেরুলেন, আবার ফিরলেন। কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পেল না।

গৌরীমার সর্বাঙ্গে বসন্তের গুটি প্রকাশ হল পরদিন। ওদিকে একই সময়ে মা-ঠাকরুনেরও বসন্ত হল।

ডাক্তার কাঞ্জিলাল বললে, 'মায়ে-ঝিয়ে ভাগাভাগি করে রোগ-ভোগ নিয়েছেন, আমরা তার কী করব!'

রোগে পড়ে থেকেও মা-ঠাকরুনের ভাবনা কত গৌরীমার জন্যে। শরৎ মহারাজকে বলছেন, 'শরৎ, ও বাড়িতে বেশি জায়গা নেই, খুকিকে এখানে নিয়ে এস। নইলে ওকে দেখবে কে?'

দুর্গা মাতৃভবনে চলে গেলে দামোদরশিলার নিত্যপূজা ভোগ হবে কি করে? গৌরীমাকেও বা কে পথ্য জোগাবে?

'তবে খুকি থাকুক গৌরীর কাছে।'

গৌরীমার অসুখ খুব বাড়াবাড়ি। চিকিৎসকরা জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

একান্তে নিজের কাছে দুর্গাকে টেনে নিয়েছেন গৌরীমা। গাঢ় স্বরে বলছেন, 'আমি যদি মরে যাই তুই কিছুতেই বাড়ি ফিরে যাবিনি, মা-ঠাকরুনের কাছে গিয়ে থাকবি।'

দুর্গা শুধু বলে, 'তুমি ভালো হবে মা, ভালো হবে।'

'শোন্, তোব বাবা মা দাদা যেই নিতে আসুক, কিছুতেই ফিরে যাবিনি। তুই আশ্রমে থাকবি, আশ্রমকে বড় করবি। তোর কত শিষ্য সন্তান হবে, তাদের মা হয়ে থাকবি। যদি সংসারে ফিরে যাস, ওদের কে দেখবে ?'

'না মা আমি ফিবে যাব না।' কান্নাছলছল চোখে দুর্গা বলছে, 'আমি আশ্রমে থাকব। আশ্রমকে বড় করব।'

অসুখের মধ্যে হঠাৎ একদিন গৌরীমা চেঁচিয়ে উঠলেন : 'ও কে ?'

'কাকে ডাকছ মা ?'

'ঐ যে লক্ষ্মীদিদি এসেছেন।'

'লক্ষ্মীদিদি এসেছেন ? তা হলে আব ভয় নেই। এবার মা তুমি শিগগির ভালো হয়ে উঠবে।'

কেননা লক্ষ্মীদিদিই তো শীতলা।

ভালো হবার পর গৌরীমা গড়পারে শীতলাতলায় গিয়েছেন। সেখানকার পুজুরি বামুন শীতলার সেবক হয়েও আবার বিষ্ণুভক্ত। গৌরীমাকে বললেন 'মা গো, একবার বৃন্দাবনে যাবার বড় সাধ। নিয়ে যাবে সঙ্গে করে ? ব্রজেশ্বরী রাধারানীকে দেখে আসতাম।'

'রাধারানী দেখতে বৃন্দাবনে কেন ? কলকাতায়ই দেখিয়ে দেব।' গৌরীমা চোখমুখ উজ্জ্বল করলেন : 'আর তা জ্যান্ত রাধারানী।'

মা-ঠাকরুনকে গিয়ে বললেন সে কথা। মা-ঠাকরুন বললেন, 'ছি, অমন কথা কি বলতে আছে ? রাধা যে চিন্ময়ী।'

'আর তুমি কে? তুমিও চিন্ময়ী।'

'কি গো, রাধারানী দেখালে না?' পুজুরি আবার ধরল গৌরীমাকে।

'হ্যাঁ, চলো। তোমাকে নিয়ে যেতেই এসেছি।'

মা-ঠাকরুনের কাছে গৌরীমা নিয়ে গেলেন ব্রাহ্মণকে। মা-ঠাকরুনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ভালো করে তাকিয়ে দেখ, ইনিই রাধারানী। কৃষ্ণের লক্ষ্মীশক্তি, সর্বশক্তিগরীয়সী।'

মায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ব্রাহ্মণ। এত কান্তি এত দ্যুতি এত শান্তি এত শক্তি যেন মানববিগ্রহে দেখেনি কোনোদিন। ভাবতেও পারেনি। সাষ্টাঙ্গ লুটিয়ে প্রণাম করল পুজুরি।

> 'জগতমোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
> অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরানী॥
> রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান
> দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥'

যেমন মৃগমদ আর তার গন্ধ। যেমন বহ্নি আর তার দীপ্তি। তেমনি ঠাকুর আর ঠাকুরানী।

ব্রাহ্মণ গদগদকণ্ঠে শুধু বলতে লাগল: 'বন্দে রাধাং আনন্দ-রূপিণীং।'
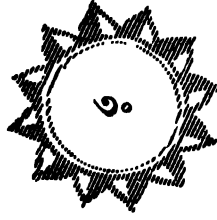
আশ্রমে খবর পৌঁছুল জননী গিরিবালা নিদারুণ পীড়িত, অন্তিম-কালে দেখতে চান কন্যাকে।

তখুনি ছুটলেন গৌরীমা।

কালীর কিঙ্করী গিরিবালা। কত গান বেঁধেছেন, গেয়েছেন তন্ময় হয়ে। কখনো :

'কালী করাল বদনা, মুণ্ডমালাবিভূষণা
ভালে অর্ধশশী ষোড়শী লোলরসনা।
ত্রিনয়না অকলঙ্ক -বিধু-আস্য-হাস্য শ্যামা সুদশনা॥'

কখনো ডাকছেন দক্ষিণাকালীকে :

'কোথা মা দক্ষিণাকালী কৃতান্তবারিণী
দক্ষরাজসুতা শিবে শিব-সীমন্তিনী।
দুঃখে পড়ে ডাকি দুর্গা রক্ষ মা আমারে,
দে ভবানী ভবে আসা দক্ষিণান্ত করে॥'

কিংবা :

'আমার দেহযন্ত্রে যন্ত্রী হয়ে ওরে প্রাণ,
অবিশ্রাম করো কালীর গুণগান।
বাজিয়ে দেহ-সেতারা কর গান বলে তারা,
. ভাব সদা ভব-দারা যদি ভবে চাহ ত্রাণ॥'

গৌরীমা এসে পৌঁছুলে গিরিবালাকে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হল।

'আমি মা কালীর মেয়ে।' দু হাত গঙ্গার দিকে বাড়িয়ে দিলেন গিরিবালা। ডাকতে লাগলেন, 'মা গঙ্গে, মা কালিকে, মা দুর্গে।' জপ করতে-করতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

শেষ কৃত্য সমাপ্ত করে গৌরীমা ফিরলেন আশ্রমে। কিন্তু মা কি কখনো মরে, মা কি কখনো ত্যাগ করতে পারে সন্তানকে?

গৌরীমা নিজের তৈরি করা গান ধরলেন :

'অভয় পরমানন্দ পেয়েছি মা তোমার পদকমলে।
আনন্দে আনন্দময়ী আমি ভ্রমিতেছি ভূমণ্ডলে ॥
তোমার কোল শীতল পেয়েছি
মাই-মুখে মুখ দেখিতেছি—
কালেরে ফাঁকি দিয়েছি, ঢাকা আছি তোর আঁচলে ॥'

সর্বত্রই মা! মা কোথায় এই প্রশ্নই নিরর্থক। যা দেখি যা ধরি যা জানি যা ভাবি সবই মা। কাকে খুঁজব? যে লুকিয়ে থাকে তাকে খুঁজতে হয়। কিন্তু যে সর্বতঃ সপ্রকাশ তাকে খুঁজব কী! মাটি ধরে যদি মা-টি না বুঝতে পারি, বলতে পারি, তবে তত্ত্বাতীতা ভাব তীতা মাকে ধরব কোথায়? অন্বেষণের চোখ বন্ধ করে প্রত্যয়ের চোখ খোলো। জগদ্দর্শনমাত্র যার আত্মস্মৃতি না হয়, মাকে মনে না পড়ে, সে কি করে বিশ্বের অতীত নিরঞ্জন ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হবে?

গঙ্গাধর বাঁড়ুয্যের ছেলে কালীপদর কালীদর্শনের অভিলাষ। গৌরীমার কাছে এসে বারে বারে জানায় তার প্রার্থনা।

একদিন বললেন গৌরীমা, 'চল কালী, তোকে আসল কালী দেখিয়ে আনি।'

'আসল কালী?'

'হ্যাঁ, মা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়, নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু। যিনি অখিল জগৎকে পরিপালন করেছেন, বিনাশ

করছেন অশুভভয়ের পিশাচকে। চল এমনটি আর দেখিসনি কোথাও।'

মায়ের বাড়িতে কালীপদকে নিয়ে গেলেন গৌরীমা।

মাকে বললেন, 'মা, তোমার এই ছেলেকে এনেছি, ওকে কৃপা করো।'

মা-ঠাকরুন তাকালেন কালীপদের দিকে।

সন্দেহ কী, এই তো আসল কালী। মা অভয়া, অমৃতময়ী, অসুরক্ষয়করী, মহাব্রতা। বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবী। বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী।

কালাপদকে মা দীক্ষা দিলেন। কালীব কালহরণ স্পর্শ কালীপদ লাভ করল।

পদ্ম আর জবাফুল নিয়ে এসেছে কালীপদ।

মা বললেন, 'সবই আমার পায়ে দিও না বাবা। কিছু আমার হাতে দাও। আমি ঠাকুরেব পুজো কববো।'

তাই হল। কিছু ফুল হাতে কিছু ফুল পায়ে দিল কালীপদ। হাতের ফুল দিয়ে মা আবার ঠাকুরের পুজো করলেন।

একই ভগবান তাঁর নানা বিগ্রহ। 'একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ।' 'একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ!' 'একই স্বরূপ দুই ভিন্ন মাত্র কায়।'

'একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ॥'

গৌরীকে বললেন, কলিকালে চণ্ডীপাঠই মহাযজ্ঞ।'

প্রতি বছর শারদীয় পূজায় কল্প: "স্তের দিন থেকে শুরু করে পর-পর সতেরো দিন চণ্ডীপাঠ ও হোম করেন গৌরীমা। সেবার পূজায় উদ্বোধন-ভবনে মার সামনে চারদিন যথারীতি চণ্ডীপাঠ করলেন। মহানবমীতে দক্ষিণান্তে হোম করে মায়ের পায়ে একশো-

আটটি রক্ত পদ্ম অঞ্জলি দিয়ে বললেন, 'মা, আজ আমার চণ্ডীপাঠের ব্রত উদযাপন হল, সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যা তোমার সামনে চণ্ডীপাঠ করে।'

'একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম।' হৃতরাজ্য সুরথ একাকী ঘোড়ায় চড়ে গহন বনে ঢুকল। ঢুকল মৃগয়াচ্ছলে। মৃগয়া মানে সন্ধান, আত্মানুসন্ধান। ঘোড়া মানে ইন্দ্রিয়। গহন বন বিষয়ারণ্য। একা চলেছেন, কেননা একা না হলে একক-সখাকে পাওয়া যায় না। আমার বলতে কেউ নেই। আমি একা। এই একা হওয়ার জন্যেই সাধনা। একা হলেই বোঝা যাবে আমি একা নই, আমার মা আছেন। আমার মা আছেন আর আমি আছি।

দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।' মা-ই আমাদের অসঙ্গা তরণী। আর দ্বিতীয় কারু সাহায্যের দরকার নেই। 'দ্বিতীয়া কা মমাপরা।' তরণীও তুমি, কর্ণধারও তুমি। তুমিই এই দুর্গম ভবসাগরের একাকী পারকর্ত্রী।

'আমি এসেছি।' গিরিশের বাড়িতে গিরিশের কাছে এসে দাঁড়ালেন শ্রীমা।

বলরামের বাড়িতে আছেন তখন মা, কাছেই গিরিশের বাড়ি। দু-বাড়িতেই দুর্গাপুজো হচ্ছে, দু-বাড়িতেই উপস্থিত থেকে পুজো নিচ্ছেন। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল মার, গিরিশের বাড়িতে খবর পাঠালেন সন্ধিপূজায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

গিরিশ আর কী করবে, অবোধ ছেলের মত কাঁদতে লাগল। কান্না ছাড়া সন্তানের আর কী আছে, কী থাকতে পারে।

গভীর রাত্রে সন্ধিপূজা। মা ডাকলেন গৌরীমাকে। বললেন, 'গিরিশ বড্ড কাঁদছে, টানছে আমাকে। ওর ওখানে যাব ?'

'সন্তানের প্রাণের টান, যাবে বৈকি।'

গৌরীমাকে নিয়ে মা চললেন। সরু গলি দিয়ে গিরিশের

খিড়কির দরজায় এসে দাঁড়ালেন। নিজেই করাঘাত করলেন দ্বারে। ডাকলেন, 'গিরিশ, আমি এসেছি।'

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং। আমিই এই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বরী। পার্থিব ও অপার্থিব ধনদাত্রী। যং যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি। যাকে ইচ্ছে করি তাকেই উন্নত করি। উন্নত-উজ্জ্বলরসা ভক্তি দিই।

শশী ঘোষের স্ত্রী নগেন্দ্রবালা মায়ের কাছে আসে, বসে, কথা শোনে আবার বাড়ি চলে যায়। দীক্ষা নেয় না।

একদিন গৌরীমা তাকে বললেন, 'বৌমা, তোমার এত ভক্তি, মায়ের কাছে তুমি দীক্ষা নাও, তোমার ভালো হবে।'

নগেন্দ্রবালা বিজ্ঞের মত হাসল। বললে, 'আর কী ভালো হবে বলো। দীক্ষা নেবার পরেও গুরুকে যদি সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে ভাবতে না পারি তবে মিছিমিছি একটা মন্তর নিয়ে কী হবে?'

বটে! উর্ধ্ব তুমি দেখেছ কী! সরল মুখে গৌরীমা বললেন, 'দেখ না একবার নিয়ে।'

কথাটা নগেন্দ্রবালা উদাস হাস্যে উড়িয়ে দিল।

সেদিন কী হল, গৌরীমা হাত ধরতেই নগেন্দ্রবালা রাজি হল গঙ্গাস্নানে। 'স্নান করে আসি চলো, তারপর মার পুজো দেখব।' বললেন গৌরীমা।

'মন্দ কী। চলো, কোনোদিন দেখিনি ওঁর পুজো করা।'

স্নান সেরে এসে মার পূজার কাছে বসলেন দুজনে। দেখতে দেখতে নগেন্দ্রবালার কেমন যেন ঘোর লাগল। কত দিন কাছে বসেছি এমন মধুর তো লাগেনি। ঘ্রাণে এমন লাগেনি তো সুগন্ধ। সৃষ্টি হয়নি তো এমন ভাবলোক।

'দীক্ষা নিলে মন্দ কী।' বললেন নগেন্দ্রবালা, 'সবাই যখন বলছে আমার হবে—'

দীক্ষা নিয়ে অন্য রকম হয়ে গেলেন নগেন্দ্রবালা। 'মার মন্ত্রের কত শক্তি তা তুমি জানো না—বলেছিলেন গৌরীমা। ঠিকই বলেছিলেন। এখন আমি এত আনন্দ রাখি কোথায়? এত সুগন্ধ নিয়ে করি কী।'

'আপনি যে আমার এ কী করলেন বলতে পাচ্ছি না।' গৌরীমাকে বললেন বিহ্বল হয়ে।

মাকে প্রণাম করে যখন চলে যাচ্ছেন, নগেন্দ্রবালাকে মা আশীর্বাদ করে দিলেন: 'সংসারে থাকবে বটে কিন্তু খড়্‌লী নারকোলের মত থাকবে। আসক্তিশূন্য হয়ে থাকবে।'

সব চেয়ে বেশি অবাক শশী ঘোষ।

'গৌরমা, এ আপনি কী জাদু করে দিলেন!'

'সব আমাদের আনন্দময়ী অন্নপূর্ণা মায়ের কৃপা। সংসারে থেকেও থাকলেন যোগিনী হয়ে।'

'এ আবার কাকে আনলে?' গৌরীমার উপর মা-ঠাকরুন রুখে উঠলেন: 'তোমার আর কোনো কাজ নেই?'

'তোমারই আবার কোন কাজ!' হাসলেন গৌরীমা: 'তবে এসেছ কেন? দেহ ধরেছ কেন? কেন পিঁপড়ের রাশ ঠেলে দিয়েছেন ঠাকুর?'

'তা হলে আর কী করা।' মা-ঠাকরুন নরম হলেন: 'এটি কে?'

'আমাদের শৈলবালা। দুর্লভ উকিলের স্ত্রী।'

'কিন্তু গৌরদাসী, একে কোন ঠাকুর দেব?'

গৌরীমা যেন মায়েরই প্রতিচ্ছায়া। গৌরীমা যা বললেন সেই অনুসারে দীক্ষা হল।

আর দুর্গা যেদিন দীক্ষা নেয়, হাতে একটি দুধের ঘটি নিয়ে এসেছিল। মা সেটি নিলেন হাত বাড়িয়ে। বললেন, 'আজ মহাষ্টমীতে তোমায় দীক্ষা দেব।' দুধের ঘটিটি রাখলেন ঠাকুরের সামনে, মৃদু হেসে বললেন, 'এই তোমার পূর্ণঘট স্থাপন হল।'

মায়ের সেই পূর্ণঘটই সারদেশ্বরী আশ্রম।

'দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।' দুর্গাকে প্রণাম। দুর্গপারাকে প্রণাম। প্রণাম সারাকে, স্থিরাকে, সর্বকারিণীকে।

আর এই সারা স্থিরা শুদ্ধা বিদ্যাই মা সারদা।

আশ্রমের উদ্দেশ্য কী? মাতৃজাতির সেবা। নারীর মধ্যে সেই জ্যান্ত জগদম্বার উদ্বোধন ঘটানো। হরজটাজালে যে গঙ্গা অবরুদ্ধ হয়ে আছে তাকে ভূতলে বহমানা করা।

নারী সংসারে দাসী নয়, সমাজে অবলা নয়, নারীই বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী, মাহেশ্বরীস্বরূপা এই চেতনাকে জাগ্রত করা। প্রাণপ্রতিষ্ঠ করা। নারী শুধু স্বাদুসলিলগর্ভা মেঘমালা নয়, তার স্তরে রয়েছে অনঘা বৈদ্যুতী শক্তি—সেই বার্তা নিয়ে আসা। নারীই বজ্রধারিণী শক্তি, চণ্ডমুণ্ডের নিধনকর্ত্রী। নারীই আবার প্রাণরূপিণী সম্পদরূপিণী লক্ষ্মী, বৈমুখ্যরূপিণী লজ্জা, মহতী ব্রহ্মবিদ্যা, গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা, দৃঢ়প্রত্যয়রূপা পুষ্টি, ধারণাবতী বুদ্ধি—তাকে প্রণম্য করে তোলা।

গৌরীপুরের টাকার আশ্রমভবন তৈরি হওয়া সুরু হয়েছে, কিন্তু তারপর? আরো অনেক যে দরকার। আসবে কোত্থেকে?

'কাদা চটকাতে-চটকাতে দেহ যে ক্ষয় করে ফেললেন, মা, আপনার ঠাকুর কোথায়?' কেউ বুঝি পরিহাস করে বললেন গৌরী-মাকে, 'তাঁর জল ঢালা কি ফুরিয়ে গেল?'

শত অভাবে নৈরাশ্যেও টলবেন না গৌরীমা। তিনি নিয়তা, নিশ্চলা, তাঁর নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। বললেন, 'এই আশ্রম যা চলছে এ কী তোমরা করে দিলে, না, আমি করে দিলুম? সবই ঠাকুর-ঠাকরুনের।'

এক ধনী পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করতে প্রস্তুত। উল্লাসে সবাই লাফিয়ে উঠল। কিন্তু গৌরীমার মুখ অপ্রসন্ন। সে কী, আপনি জয় দিয়ে উঠছেন না?

'কে জানে কেন, পাচ্ছি না জয় দিতে। টাকাও অনেক, অভাবও অনেক, কিন্তু আমার মনে খটকা লাগছে, বোধহয় কোনো গোলমাল আছে।' বললেন গৌরীমা, 'দাতার বিষয় একটু তলিয়ে ভালো করে জেনে এস তো।'

গৌরীমার সন্দেহ অমূলক নয়। দাতার অর্থোপার্জনের পথটা প্রশস্ত নয়, কাদায় কদর্যতায় ভরা। গৌরীমা বললেন, 'এমন টাকা পঞ্চাশ লক্ষ হলেও ছোঁব না।'

কালীপদ আরেক টাকার খোঁজ আনল।

'আমার মন হালকা হচ্ছে না। ভালো করে একটু খোঁজ নাও কালীপদ।'

কালীপদ খোঁজ নিয়ে জানল বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বঞ্চিত করে টাকা সংগৃহীত হয়েছে। বিষাদে হাসলেন গৌরীমা, বললেন, 'আমার মন তাহলে ঠিকই বলেছিল। এই বঞ্চনার টাকা আমি নিতে পারব না। তুমি গিয়ে বোলো আশ্রমের জন্যে যে টাকাটা বরাদ্দ হয়েছিল তাই যেন সেই বিধবাকে দিয়ে দেওয়া হয়। তাতেই আশ্রমের সেবা হবে কল্যাণ হবে।'

আশ্রমবাসিনীদের কাছে পুরাণের গল্প বলছেন, হঠাৎ অদূরে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে পেলেন। কে কাঁদে রে? উঠে পড়লেন গৌরীমা। সবাই তাঁকে নিবৃত্ত করতে চাইল, এখন দশটা

রাত, কোথায় যাবেন সন্ধান নিতে? ঐ তো কাছেই ঐ বাড়ি, ঐ বাড়ি থেকেই বিপন্নার কান্না আসছে, আমি যাব। যদি সম্ভব হয়, প্রতিকার করব। কারু বারণ শুনলেন না, লাঠি হাতে একাকিনী বেরিয়ে পড়লেন। বললেন, 'শুধু অন্তঃপুরে নয় বাইরের মেয়েদের বিপদের সময়ও আমায় তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।'

কার ঘরের কী কলহ, কোন বিপদে না জানি জড়িয়ে পড়েন, আশ্রমবাসিনীরা পথ চেয়ে বসে রইল। রাত একটার কাছাকাছি দেখা গেল গৌরীমা এক অবগুণ্ঠিতা বধূর হাত ধরে আসছেন আর পিছনের সঙ্গী পুরুষকে বকছেন থেকে থেকে। ওমা, গৌরীমা দেখি আশ্রমে ঢুকলেন না, কোথায় চলে গেলেন অন্য দিকে।

রাত তিনটের সময় ফিরলেন। বললেন, 'পুলিশ ডাকিয়ে এনে বউটাকে উদ্ধার করলাম। নিগ্রহের চূড়ান্ত হচ্ছিল বউটার। পৌঁছে দিয়ে এলাম বাপের বাড়ি। শুধু এতেই কাজ ফুরোল মনে করি না। যে এখন বনবাসে, সে যে আসলে লক্ষ্মী, ওর শ্বশুর বাড়িতে সেটা প্রতিষ্ঠা করে তবে ছুটি নেব।'

হলও তাই। গৌরীমার মধ্যস্থতায় মিটমাট হল, অনুতপ্ত স্বামী নিয়ে গেল স্ত্রীকে। তবু ছাড়লেন না গৌরীমা। বারে বারে খোঁজ নিলেন, কেমন আছ গো বৌমা? বধূটি বললে সলজ্জমুখে, 'ভালো আছি মা।'

সকালবেলা গঙ্গায় নাইতে গেছেন, দেখেন ঘাটভরা লোক হায়-হায় করছে। এত হায়-হায় কিসের? তাকিয়ে দেখেন একটা মেয়ে স্রোতে ভেসে চলেছে, ডুবছে, ভাসছে, আবার তলিয়ে যাচ্ছে। হায় হায় করা সোজা, তাই করছে সকলে সমস্বরে।

'একটা প্রাণ ডুবে যাচ্ছে আর তোমরা মরদেরা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছ?'

'কী করব মা, সাঁতার জানি না।'

'সাঁতার জানলেও বাঁচানো যায় না সব সময়। কখনো কখনো নিজের বিপদ টেনে আনতে হয়।'

এত হিসেব! 'জয় মা কালী।' বলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গৌরীমা।

'আর এগোবেন না, মারা পড়বেন।' তটস্থ লোক কোলাহল করে উঠল।

আরো এগিয়ে, সমস্ত প্রতিবন্ধ পরাস্ত করে গৌরীমা ধরলেন মেয়েটাকে। আরো-আরো লোক তখন নামল। ধরাধরি করে মেয়েটাকে পাবে তুলল। ঠাকুর দয়া করেছেন, মান রেখেছেন গৌরদাসীর, মেয়েটা চোখ চেয়েছে।

শুধু কী মানুষের সেবা? না, পশুপাখিরও।

কটা হনুমান একটা কুকুরছানাকে তুলে নিয়ে ছাদে উঠেছে। যে বাড়ির ছাদে উঠেছে তার সিঁড়ি নেই। কী হবে? কুকুর ছানাটাকে তো মেরে ফেলবে আঁচড়ে-কামড়ে। ঢিল ছুঁড়েও কিছু করা যাচ্ছে না। উপায়? শক্ত করে কাপড় পরলেন গৌরীমা, কোমরে একটা লাঠি গুঁজে দেয়ালের পাইপ ধরে উঠতে লাগলেন উপরে। ছাদের আলসেয় এসে দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাতে লাগল হনুমান। গৌরীমার ভয়-ডর নেই। কতদূর উঠে এক হাতে দেয়াল ধরে দাঁড়ালেন, আরেক হাতে ঘোরাতে লাগলেন লাঠি। বনবন করে ঘোরাতে লাগলেন। ঘুরন্ত লাঠি দেখে হনুমানগুলো ভয় পেল। হুপহাপ করে লাফিয়ে সরে পড়ল এধার ওধার। গৌরীমা উঠলেন আস্তে আস্তে। ছাদে পৌঁছে কুকুরছানাটাকে কোলে নিলেন, বেঁচে আছে অক্ষত আছে। কাপড়ের মধ্যে বাচ্চাটাকে বেঁধে আস্তে আস্তে নামলেন দেয়াল বেয়ে।

'একটা কুকুরের বাচ্চার জন্যে কেউ এতখানি ঝুঁকি নেয়? এতটা

সাহস করে?' সবাই একযোগে আপত্তি করে উঠল : 'পড়ে গেলে কী হত বলুন তো।'

'তাই বলে কৃষ্ণের একটা অসহায় জীবকে চোখের সামনে এমনি মরতে দেখব?' গৌরীমা হাসলেন : 'যদি পড়ে যেতাম? যিনি কুকুরছানাকে রক্ষা করেছেন তিনিই আবার তোদের গৌরীমাকে রক্ষা করতেন।'

শুধু জপ করো। তোমার তনুকে জপতনু করে তোলো, মন্ত্রাক্ষরময়ী হয়ে ওঠো। জাগাও কুলকুণ্ডলিনীকে। নিষ্ঠায় নিশ্চল থাকো। জপনিষ্ঠা, গুরুনিষ্ঠা, ইষ্টনিষ্ঠা। জপেই নির্মলীকরণ, ভূতশুদ্ধি। যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ। জপাৎ শক্তি। আর সে শক্তি সর্বগা, শাশ্বতী। আর সেই শক্তিই সিদ্ধির জনয়িত্রী। তাই জপাৎ সিদ্ধি। জপেই দ্বন্দ্বাতীত চিদানন্দ। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।

আশ্রম ভবনের উদ্দেশ্যে টাকা আসতে লাগল—আরো-আরো টাকা। ইচ্ছা যখন শুভ, শুভযোগ ঘটবেই। উদ্দেশ্য যখন মহৎ, মহৎ প্রাণ আকৃষ্ট হবেই। আর মহৎ প্রাণই মহৎ বিত্ত।

মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে-করতে গৌরীমা চলেছেন গঙ্গাস্নানে, পথে কুমার ব্রহ্মচারী নগেন মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা। নগেনের অনেক দিন থেকে ইচ্ছে গৌরীমার কাছে দীক্ষা নেয়। হঠাৎ মহামন্ত্র শুনে সোল্লাসে বলে উঠল, 'মা, এই তো আমার দীক্ষামন্ত্র পেয়ে গেলাম। ভাস্বর-সুন্দর মন্ত্র।'

গৌরীমা একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। পরে বললেন, 'বাবা, তোমার তো কৃষ্ণমন্ত্র নয়, তোমার শক্তিমন্ত্র।'

শক্তিমন্ত্রে কী হবে? শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হবে। জড়কে চিনতে পারবে ছদ্মবেশী চৈতন্য বলে। জানো তো মহামায়ার উৎপত্তিও নেই কর্মও নেই। শুধু দেবতার জন্যে তাঁর আবির্ভাব, দেবকার্য-সিদ্ধিই তাঁর কর্ম। তোমার ইন্দ্রিয়বৃন্দই দেবতা। তারা যখন

স্থূল অসুরদ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন যদি আর্ত হয়ে তারা মহামায়ার আবির্ভাব প্রার্থনা করে তখন সন্তানবৎসলা মা প্রকাশিত হন, অসুর বিনাশ করে তোমাকে নিত্য আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করেন।

'মা গো, কালী বড় না কৃষ্ণ বড়?'

নতুন গাছের কলা নিয়ে দু ভাইয়ে ঝগড়া কে কাকে ভোগ দেবে। এ বলে আমার গোপাল খাবে, ও বলে আমার কালী খাবে। শেষে ঠাকুরঘর খুলে দেখে ছোট ভাইয়ের কালী দাদার গোপালকে কোলে বসিয়ে কলা খাইয়ে দিচ্ছে।

'মানুষের ঘোলা মন, দৃষ্টি খাটো, তাই এত ভেদবুদ্ধি। কেবল ঝগড়া করে মরে। একই লোক তার নানান পরিচয়।' বললেন গৌরীমা।

'মা, আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?' আরেকজনের প্রশ্ন।

'বড় কঠিন প্রশ্ন করেছ বাবা।' বললেন গৌরীমা, 'হ্যাঁ-ও বলতে পারি না, না-ও বলতে পারি না। এ সব কথা কি খুলে বলতে আছে? তবে একটা কথা জেনে রাখো, এ দেহ এ মানবজীবন পাওয়াই ভগবানকে দেখে যাবার জন্যে। ভগবান ভক্তপরাধীন, ভক্তের কাঙাল, ভক্তের প্রার্থনায় তিনি মূর্তি ধরে দাঁড়াবেন সামনে, এ আর বেশি কথা কী। ভক্তচিত্তবিনোদনই তো ভগবানের ব্রত। ভক্তের ভিতরে-বাইরে ভগবান।'

তবে 'পাবি না খেপা মায়েরে, খেপার মত না খেপিলে।' 'ডাক দেখি মন ডাকের মতন, শ্যামা কেমন থাকতে পারে।'

"ডেকে-ডেকে ক্লান্ত যখন চেষ্টা করো কাঁদতে।
ডাকার চেয়ে কান্না দামী—মাকে কাছে আনতে।"

তারপর মনে করো রামপ্রসাদের গান :

'কেমন করে ছাড়ায়ে যাবা
দেখব এবার অধম বলে।

ছেলের হাতে কলা নয় মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা ॥
এমন ছাপান ছাপাইব, মা গো, খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা।
বৎস পাশে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা ॥
প্রসাদ বলে ফাঁকি জুঁখি, মা গো, দিতে পার বোলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা ॥'

আশ্রমে সদর দরজার পাশে রাস্তার দিকে একখানি শ্বেত পাথরে লেখা হয়েছে : 'সন্ন্যাসিনী শ্রীশ্রীগৌরীমাতা প্রতিষ্ঠিত।'

বাইরে থেকে আসছেন মা, গাড়ি থেকে নামতেই লেখাটা চোখে পড়ল।

'এ কী, আমার নাম কেন বসিয়েছ?'

'তাতে কী হয়েছে?' কর্মী সেবক আপত্তির কারণ খুঁজে পেল না।

'কী হয়েছে মানে? আশ্রম মা-ঠাকরুনের। আমার নাম আসে কোত্থেকে?' বলে আশ্রমের মধ্যে না ঢুকে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

মহাবিব্রত হল কর্মী। বললে, 'মা-ঠাকরুনের নাম তো বড় বড় অক্ষরে আছেই, আপনার নামটা ছোট-ছোট অক্ষরে—'

'না, আমার নামটা একেবারেই থাকবে না, জলাঞ্জলি যাবে। শুধু থাকবে এক নাম, রাজরাজেশ্বরীর নাম।'

তাই, তাই হবে। তবে গৌরীমা গাড়ি থেকে নামলেন।
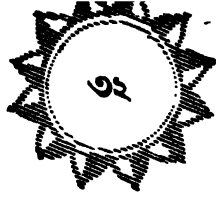
'বাইরের চাকচিক্যে মেয়েদের সৌন্দর্য বাড়ে না। মেয়েদের আসল সৌন্দর্য—তাদের দেহ-মনের পবিত্রতায়।' বললেন গৌরীমা।

'মেয়েমানুষের পবিত্র থাকা—এ কি কম জিনিস!' বলছেন মা-ঠাকরুন, 'সতী মেয়েমানুষের সামনে মুনি ঋষি দেবতা গন্ধর্ব হাত জোড় করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মেয়েদের বিদ্যেসাধ্যি বড় কথা নয়, রূপগুণও বড় কথা নয়—মেয়েরা মঙ্গল ঘট, পবিত্রতার মঙ্গল ঘট।'

আরো বলছেন, 'জামা-সেমিজে সাজসজ্জায় কিছু শুচিতা রক্ষা হয় না। নারী শুদ্ধ যদি তার দেহ-মন শুদ্ধ। সারা জীবন যদি শুদ্ধ থাকে তবেই তো তাকে বলি সতী। পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবেই মেয়ের গুণ গাই।'

গৌরীমা বললেন, 'মেয়েরা শক্তিমতী হও।'

মা-ঠাকরুন বললেন, 'শক্ত হতে হবে। শক্ত, তিন কুল মুক্ত। ধর্মকে যে আশ্রয় করে, ধর্মই তার রক্ষাকর্তা হয়। কায় বাক্য মন তিন নিয়ে ধন।'

এক শিষ্যা মা-ঠাকরুনের কাছে এসেছে তার মেয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে। 'ভারি একগুঁয়ে মেয়ে মা, কিছুতেই বিয়ে করবে না।'

'কী বলে মেয়ে?'

'বলে, নিজে তো বিয়ে করে ভাজা-ভাজা চচ্চড়ি হচ্ছ, আবার আমায় নিয়ে টানাটানি কেন ? আমি বললাম, আমি না হয় চচ্চড়ি হচ্ছি, তুই ডালনা হবি। আপনি যদি মা একবার বলে দেন, তবে আর আপত্তি করবে না বিয়ে করতে।'

'বিয়ে না করে মেয়ে কী করবে ?'

'বলে কুমারী থেকে ঈশ্বর ভজনা করবে।'

'কথাটা মন্দ কী! সবাই কি শুধু বিয়ে আর সংসার নিয়েই থাকবে ? আধার যদি ভালো হয়, ছেলেরা যেমন সাধু সন্নেসী হয়ে ত্যাগের পথে থাকে তেমনি মেয়েরাও থাকবে।' মা-ঠাকরুন গম্ভীর হলেন। 'শোনো, মেয়ে যদি ভগবানকে ভজে থাকতে চায় তুমি যেন তার হন্তা হয়ো না।'

সেই মেয়ে কৌমারব্রত নিয়েছে। হয়ে উঠেছে ভাগবতী শিখা।

কুমারীকে কী বলেছে শাস্ত্রে ?

শুক্লাভা, শুভকরী, গায়ত্রী, বাগবাদিনী, বেদান্তবিদ্যাপ্রদা। আত্মরূপেশ্বরী, শোভাসাগরগামিনী, ভুবনদোষসংশোধিনী। জয়বতী, মহালক্ষণা, সকলভোগদা, কমলমধ্যসম্ভাবিনী। কুলকলা বিমলা হৃৎপদ্মস্থিত পাদুকা।

বলরামভবনে এক সাধু এসেছে।

একতলার ঘরে জপ করছে, রাধারানী সহ চারজন কুমারী সে-ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়েছে। সাধু তক্ষুনি জোড় হাতে তাদের প্রণাম করলে। বললে, মায়েরা আমার উপর প্রসন্ন আছ তো ?

মেয়েরা তক্ষুনি দে ছুট। কিন্তু সাধু একজনের হাত খপ করে ধরে ফেলেছে। বলছে, 'উত্তর না দিলে ছাড়ব না। বলো, আমার উপর প্রসন্ন তো ?'

বাকি তিনজন ছুটে এসে মাকে নালিশ করল।

'কী মা, বলো প্রসন্ন ?'

'হ্যাঁ, বাবা, প্রসন্ন।' চতুর্থ মেয়েও ছাড়ান নিয়ে দে দৌড়।

মা-ঠাকরুন এ নিয়ে কিছু গোল পাকাতে দিলেন না। বললেন, এর মধ্যে রহস্য আছে।

সাধুর মনে বড় ক্ষোভ, মার দয়া হল না। দর্শন করতে পারলাম না এখনো মাকে। এত জপ-তপ এত ধ্যানধারণা সব বৃথা।

পাহাড়ী নদীতে স্নান করছে সাধু, হঠাৎ দেখল এক কিশোরী মেয়ে পাশেই কাপড় কাচতে সুরু করেছে। বিশাল চোখ হাসি আর দুষ্টুমিতে ভরা।

খুব বিরক্ত হল সাধু। বেশ ডাগর হয়েছে মেয়ে, এখানে কেন? আর জায়গা পেল না? সাধুর গায়ে জল ছিটোচ্ছে!

'হেই ছুঁড়ি, আক্কেল নেই তোর? সাধু যেখানে স্নান করছে তারই পাশে কাপড় কাচতে বসেছিস? লজ্জা নেই তোর? পালা।'

কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিয়ে কিশোরী সরে পড়ল।

রাত্রে শুয়ে-শুয়ে সাধু ভাবছে নিজের ব্যর্থতার কথা। এত কৃচ্ছ্র, এত ক্লেশ তবু মার দয়া হল না, দিলেন না দর্শন। বেটি পাষাণী।

ঘুমিয়ে পড়ল সাধু। স্বপ্নে দেখল সেই কিশোরী। বলছে অভিমানের সুরে, গিয়েছিলুম তো তোর কাছে। তুই আমায় বকে তাড়িয়ে দিলি কেন?

ঘুম ভেঙে উঠে সাধু ছুটল নদীর ঘাটে। কোথায় সেই কিশোরী। কপাল কুটতে লাগল সাধু। কী তার সেই বুকফাটা কান্না! দেখেও চিনলাম না তাকে। তুই-তোকারি করে তাড়িয়ে দিলাম। আর কি সে আসবে? এলেও কোন ছদ্মবেশ ধরে আসবে কে জানে।

মা-ঠাকরুনের কাছে এসে কেঁদে পড়ল। আর একবার দেখা দে মা।

সেই থেকে সাধু সাবধান। কোনো কুমারীকেই সে আর

গৌরীমা দুর্গামা গঙ্গাস্নানের পর রোজ আসেন। সেদিন আসতেই মা বললেন, 'রোজ কী করতে, কী দেখতে আস ?'

'আপনার অসুখ, আমাদের মনে শান্তি নেই। তাই একটু আসি দেখতে।'

'আস তো আমার ঘরে ঢুকো না, ছুঁয়ো না আমাকে। ঐ দরজার বার থেকে দেখে যেও। আমি মন তুলে নিয়েছি।'

এত যারা অন্তরঙ্গ প্রিয় তাদের উপরই মা মমতাহীন, তার মানেই মা সমস্ত মায়ার গ্রন্থি ছিন্ন করে দিচ্ছেন।

নলিনী বললে, 'আমরা থাকলে পিসিমার যদি কষ্ট হয় তা হলে আমরা চলে যাই। কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা কী বলবে ? বলবে, দেখেছ ওঁর এই অসুখ আর ওরা এই সময় চলে এল।'

'তবে বেশ, থাক,' বললেন মা, 'কিন্তু আমার কাছে যেন আর তোরা না আসিস। আমি আর তোদের ছায়াও দেখতে চাই না।'

শেষ অস্ত্র, রাধুর ছেলে হামা দিতে-দিতে মায়ের বুকের উপর এসে উঠল। মা চেঁচিয়ে উঠলেন : 'যা যা নেমে যা। তোদের মায়া একেবারে কাটিয়েছি। আর পারবিনি।' ভক্ত-মেয়েকে বললেন, 'একে তুলে নিয়ে গিয়ে ওদিকে রেখে এস। আর নয়।'

'মা, খাও।' ভক্ত-মেয়ে অনুনয় করলে।

বিরক্তমুখে মা বললেন, 'তোর এক কথা। মা খাও, আর বগলে কাঠি লাগাও। কাঠিতে কী আর জ্বর পাবে মা ? আমার এ অন্তঃজ্বরা।'

'আমার তো যাবার সময় হয়ে এল।' বললেন দূরে-দাঁড়ানো গৌরীমাকে, 'দেহান্তে আমার অস্থি তোমার আশ্রমে নিয়ে রাখবে। পাঁচখানা বাতাসা নিত্য ভোগ দিলেই হবে।

গৌরীমা কাঁদতে লাগলেন।

'কেন কাঁদছিস ?' রাধুকে মা-ঠাকরুন বললেন অন্তরঙ্গ সুরে :

'কী হবে কেঁদে? কুটো ছেঁড়া করে দিয়েছি। তুই আমাকে কী করবি? আমি কি মানুষ?'

ভক্ত অন্নপূর্ণার মা দেখতে এসেছে মাকে। বললে, 'মা আমাদের কী হবে?'

'তুমি তো ঠাকুরকে দেখেছ, তোমার আবার ভয় কী! তবে একটা কথা বলি,' মা ধীরে ধীরে বললেন, 'যদি শান্তি চাও মা, কারুর দোষ দেখো না। যদি দোষ দেখতেই চাও নিজের দোষ দেখো। জগৎকে আপনার করে নাও। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।'

তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।

মা পূর্ণশান্তিতে নিত্যশান্তিতে চলে গেলেন। যে দেবী সর্বভূতে শান্তিরূপে অবস্থিত তাঁকে প্রণাম, তাঁকে প্রণাম, তাঁকে বার বার প্রণাম।
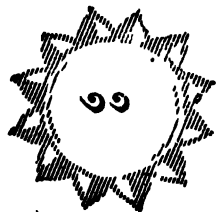
মা, তুমি শান্তি কান্তি সুশ্রী সাধ্বী নম্রা কম্রা, পূজনীয়দেরও পূজনীয়া। তুমি সর্বসম্পৎরূপা। স্বর্গে স্বর্গ-লক্ষ্মী মর্তে ক্ষিতি-লক্ষ্মী, মনোরমা শ্রী, বাক ও বিদ্যা, নৃত্য ও সুর। ব্রহ্মলোকে গায়ত্রী সাবিত্রী। জটারণ্যে গঙ্গা, মধুবনে সদাসিতা যমুনা। বৃন্দাবনে রাসরাসেশ্বরী। কৈলাসে পার্বতী, দ্বারাবতীতে রুক্মিণী। সুকৃতিশালীর রাজলক্ষ্মী, কৃতধী গৃহস্থের গৃহে গৃহলক্ষ্মী। তুমিই ধরিত্রী সর্বসহা। তুমিই বিষ্ণুচক্ষের উন্নিদ্রা পদ্মাক্ষী। তুমিই শরীরে আরোগ্য, সংগ্রামে অরিক্ষয়, দারিদ্র্যে ধনধান্য, বিপদে অত্যাগসহন বন্ধু।

'এ সাক্ষাৎ ভগবতী হ্যায়, জিতনী সেবা করোগে উতনা মেওয়া মিলেগা।' পুরীধামে গৌরীমাকে দেখিয়ে বলছেন সিদ্ধপুরুষ বাসুদেব।

বিশ্বরূপ গোস্বামী এসেছেন গৌরীমাকে দেখতে। কই গো আমার মা কই? আমি কাঙাল বিশ্বরূপ। কখনো গান করে কখনো নাচে কখনো মায়ের পায়ের ধুলো নেয়। 'যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়। তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥'

সেদিন প্রসাদের কিছুটা গৌরীমা রেখে দিলেন। বললেন, 'দুটি ভক্ত-মেয়ে আসছে, ওদের জন্যে থাক।'

'এই দুপুরবেলা কেউ আসবে না। আপনি ওটুকু খেয়ে ফেলুন।' অনুরোধ করল সেবিকারা।

'না, তারা আসছে। কাঁদতে কাঁদতে আসছে।'

ঠিক এসেছে দুজন। নিচে সদরে এসে বললে, 'আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মানসকন্যাকে দর্শন ও প্রণাম করতে এসেছি।'

'ঠাকুরমা তো এখন তেতলায় বিশ্রাম করছেন।' একটি বালিকা তাদের বাধা হল।

'বেশ তো দূর থেকেই তাঁকে আমরা দেখব, প্রণাম করব। তাঁর কাছে আমাদের নিয়ে চলো। কত দূর থেকে আসছি, কত কষ্ট সয়ে।'

শেষ পর্যন্ত এল তারা গৌরীমার কাছে। প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আশীর্বাদ নিতে এসেছি মা।'

স্নেহনেত্রে তাকালেন গৌরীমা: 'কী আশীর্বাদ?'

'আশীর্বাদ করুন যেন ভগবানে শুদ্ধা ভক্তি হয়।'

'আহা, শুদ্ধা ভক্তি কে চায় মা? সবাই হয় রোগ সারানো নয়তো টাকাপয়সা চায়, পুত্রকন্যা চায়, অকৈতব ভক্তিধন চায় কে?'

স্বতঃস্বাদময়ী অন্যতাৎপর্যহীনা ভক্তি। এই ভক্তি পরমানন্দ-

চন্দ্রিকা। এই ভক্তি সিদ্ধির চেয়েও গরীয়সী। আর যারা শুদ্ধ ভক্ত তারাই ভগবানের আপনজন। সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে ভগবৎচরণই তাদের পুরুষার্থসার।

'এসো মা এসো কাছে এসো।' গৌরীমা হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন অতিথিদের, 'তোমাদের জন্যে কখন থেকে প্রসাদ নিয়ে বসে আছি।'

পৌষ মাসে গৌরীমার জ্বর হল।

'মা, চারটি কালো আঙুর নিয়ে আয়।' সেবিকাকে বললেন।

'এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি ঠাকুমা।'

'আনিয়ে দিবি কী! আঙুর তো এসেছে।'

'এসেছে? না, মা, বাজারে এখনো যায় নি কেউ। এই পাঠাচ্ছি লোক।'

তর্ক করা বৃথা। গৌরীমা চুপ করলেন।

সুসঙ্গের রানী এসেছেন। হাতে একটি ঠোঙা। তেতলায় গেলেন মাকে দেখতে। বললেন, 'মা আপনার জন্যে কালো আঙুর এনেছিলুম—'

'আমার জন্যে বোলো না, দামোদরের জন্যে।' সেবিকাকে বললেন, 'কী, এসেছে কালো আঙুর? যা, দামুকে ভোগ দিতে বল।'

রসিকেন্দ্র চূড়ামণি। আমার পরম দয়াল। করুণাতেই এসেছে ভক্তি প্রচার করতে। লোকনিস্তারে। 'লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব।'

ছেলে হবি তো নেই-আঁকড়া আঁচল-ধরা ছেলে হ। মায়ের আঁচল ধরে পড়ে থাক, সর্বক্ষণ ঘ্যানঘ্যান কর। অনুরক্ত করে না পারিস বিরক্ত করে আদায় করে নে।

'তোমার নাম কী?'

'ভজহরি।' কৃতবিদ্য পুত্র ডাকনামটি বলতে কুণ্ঠিত হল না।

গৌরীমা বললেন, 'আহা, বেশ নাম। ভজ হরি, হরিকে ভজন করো। সর্বকারণকারণ হরিই একমাত্র নিত্য বস্তু আর সব আবর্জনা।

হরিশব্দের দুই অর্থ। সর্ব অমঙ্গল হরণ করেন আর প্রেম দিয়ে মনোহরণ করেন। আর ভজন কী? শ্রেষ্ঠ ভজন নামকীর্তন।

মায়ের কাছে সর্বক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করাও নামকীর্তন। একেবারে না ডাকার চেয়ে কিছু কামনা করে ডাকাও ভালো।

কত গান লিখেছেন গৌরীমা। সেদিন সন্ধ্যায় গান ধরলেন আবেগে :

ভবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।

বললেন, 'ওরে শ্রীরামচন্দ্র আর মা জানকী এসেছেন, ভোগ এনেছে।' মিষ্টি এনে দিলে গৌরীমা নিজেই ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। আর বলতে লাগলেন : 'হরনিধি রামচন্দ্র। হরনিধি রামচন্দ্র।' গান ধরলেন : 'শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজু মন,' 'হরণ-ভব-ভয়-দারুণং।'

রে চিত্তবর্বর, সর্বদা রামকে চিন্তা করো, অন্য শত চিন্তায় কী ফল? রে রসনা, সর্বদা রামনাম করো, বহুজল্পনে বহু অনর্থক কথায় কী হবে? রে কর্ণ, রামচন্দ্রচরিত শোনো, গীতবাদ্য শুনে লাভ কী? আর চক্ষু, সকল কিছু রামময় দেখ, রাম ভিন্ন আর সব বর্জন করো পরিহার করো।

ভাবমুখে বললেন এক আশ্রমকন্যাকে, 'তুমি আমার গৌরকে একটু ভালোবেসো।'

'কেন বাসব? আপনার গৌরের কী আছে? সন্নিসি ঠাকুর, তাঁর কী মুরোদ?'

'ও কথা বোলো না। গৌরই তো দিয়েছেন পদাশ্রয়।' চোখ বুজলেন গৌরীমা। গাল বেয়ে জল ঝরে পড়ল।

'কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন॥'

আর সেই রথযাত্রায় ?

'গৌর যদি আগে না যায়—শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে শ্যাম চলে ধীরে-ধীরে॥'

আহা, সেই গৌরে-শ্যামে ঠেলাঠেলি।

'ঠাকুমা, কার সঙ্গে কথা বলছেন আপনি ?' একটি আশ্রমকুমারী জিগগেস করলে : 'ফুল ছুঁড়ছেন কাকে ?'

'রাধারানীর সঙ্গে খেলা করছি।'

'ভাবিনী ভাবের দেহা' রাধারানী। কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা। প্রেম-পরাকাষ্ঠারূপিণী।

'সৌভাগ্য তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেমবৈচিত্র্য রত্ন হৃদয়ে তরল॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম-রত্নের আকর।
অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর॥

'আন কথা বোলো না। আমার ঠাকুরের' কথা বলো। আমার দামোদরকে একটু ভালোবাসো।'

'হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন! হা হা পদ্মলোচন!
হা হা দিব্য সদগুণ-সাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর! হা হা পীতাম্বরধর
হা হা রাসবিলাস নাগর!
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই॥'

'ওরে দামোদর আমার স্বামী। আমি এমন স্বামী বিয়ে করেছি যার মৃত্যু নেই।' আবার চোখের জলে ভেসে যাচ্ছেন গৌরীমা।

'পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল ॥
রাধিকাব প্রেমগুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটি গুণ রাধাপ্রেমস্বাদ ॥'

'ওরে আমি কী আশীর্বাদ করব ? দামোদর আশীর্বাদ করবেন।'

'অন্তরে যার বিরাজ করে গো সই
নবীন মেঘের বরণ চিকণ কালা ॥
ও তার কিসের সাধন, কিসের ভজন।
কাজ কী লো তার জপের মালা ॥

সোমবার, শিবচতুর্দশীর দিন সকালে গৌরীমা বললেন, 'ঠাকুর হতো টানছেন।'

কালী-কালা অভেদ।

'আমার হৃদয় রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
অসি ফেলে বাঁশি নে মা শ্রীরাধাবে বামে লয়ে ॥'

বিকেলে বললেন, 'আজ আমাকে ভালো করে সাজিয়ে দে।'

গরদের শাড়ি পরানো হল, গরদের চাদর, বিচিত্র ফুলের মালা গলায় দুলিয়ে দিলে।

'বা, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, তাই না ?'

'গরিমায় ভরে উঠেছেন গৌবীমা।'

'কেন উঠব না ? আমি যে রাজার বেটি। রাজরাজেশ্বরী আমার মা।' গৌরীমা তাকালেন নিজের দিকে। পরে বললেন, 'এত সুন্দর সেজেছি, না ? দেখিস এখন বেড়াতে যাব। আমার রথ আসছে।'

'আপনার জন্যে রথ কী!' বললে আশ্রমকুমারী: 'রথে যে জগন্নাথ ঠাকুর চড়েন।'

'আমিও চড়ব। দেখিস হলদে রথ। হলদে পাখির জন্যে হলদে রথ।'

'কোথায় যাবেন শুনি?'

'রামকৃষ্ণলোকে।'

'এই যে সেদিন বলেছিলেন বৃন্দাবনে যাবেন।'

'এখানে স্থানে-কালে আলাদা-আলাদা। সেখানে সব এক।'

শিবচতুর্দশীর রাতে জেগে থেকে কত পুজো দিল আশ্রমবাসিনীরা, কত স্তব-কীর্তন কত নাম-গান কত প্রার্থনা-রোদন—যেমন মহাভাবে ছিলেন তেমনি রইলেন গৌরীমা।

বললেন, 'গুরুদেবের জন্মতিথি সামনে, ঘটা করে হওয়া চাই। খিচুড়ি পায়েস ভোগ দিও।'

'আর আপনার জন্মতিথি কবে মা?'

গৌরীমা হাসলেন। বললেন, 'নিত্যানন্দের আর আমার একই জন্মতিথি।'

'মা কেমন দেখছেন দামোদরকে?'

'অনিন্দ্যসুন্দর। কিন্তু সে তো শুধু বাইরে নয় সে মানসে। সে তো শুধু বিগ্রহে নয়, স্থাবরে-জঙ্গমে।'

দুর্গামাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'দামোদরের ভার তোমার হাতে।' দুখানি হাত ধরলেন: 'আর আমার এই ভারততীর্থ। আমার স্বপ্নের আশ্রম। শক্তির দেবী-আলয়।'

পরদিন, মঙ্গলবার, অমাবস্যা, এক সন্ন্যাসিনীকে ডাকলেন: 'আমার হয়ে কালীঘাটে মাকে প্রণাম করে এস।'

শাক্ত বংশে জন্ম, দীক্ষা বিষ্ণুমন্ত্রে। দীক্ষাদাতা গুরু মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ। করলেন দামোদরের সেবা, ভুলতে পারলেন না